প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা

প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা

রমাতোষ সরকার

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশক : বিমল মিত্র, র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
মুদ্রক : সমীর দাশগুপ্ত, গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে

পৃষ্ঠা-প্রসঙ্গ নির্দেশনা

লেখা প্রসঙ্গে

শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অনুরোধে ১৯৫৯ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সাংস্কৃতিক বৈঠকে একটি বক্তৃতা দিই এবং স্বামীজী ও অন্যান্য কয়েকজন শ্রোতার অনুরোধে অতঃপর বিষয়টিকে বর্ধিত, লিখিত রূপ দিতে প্রবৃত্ত হই। সময়ের অভাবে লেখার কাজ বারবার ব্যাহত হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখাটি খণ্ডিত দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিল—১৩৬৬ সালের "বিশ্ববাণী"-তে 'প্রাচীন ভারতে গণিতচিন্তা' নামে এবং 'বেদোত্তর ভারতে গণিতচিন্তা' নামে ১৩৬৭ সালের "প্রবন্ধ পত্রিকা"-য়। বর্তমান রচনাটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ।

বাংলায় এ-জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ অভাব। বর্তমান পুস্তিকাটি প্রকাশের তাই কিছু সার্থকতা আছে। যোগ্যতর ব্যক্তির এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত বলে মনে করি।

বর্তমান গ্রন্থে গাণিতিক উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু মৌলিকতা নেই। কতকগুলি সুলভ ও দুর্লভ ইংরেজী রচনা থেকেই সব কিছু আহরণ করেছি; কয়েকটি বাংলা রচনাতে প্রসঙ্গক্রমে ব্যবহৃত সামান্য কিছু তথ্যের সাহায্যও

পেয়েছি। বৈশিষ্ট্য এইটুকু যে, মূল তথ্যগুলি সর্বত্র প্রামাণিক বা authoritative গ্রন্থ থেকে নেওয়া, কোন সংশয়-যোগ্য গ্রন্থ থেকে নয়। কিন্তু, দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে কিছু গভীরতর বৈশিষ্ট্য এ-রচনায় আছে।

প্রথমতঃ, শ্রদ্ধেয় মেঘনাদ সাহা কর্তৃক নিন্দিত "সবই 'ব্যাদে' আছে"-জাতীয় মনোভাব জ্ঞানতঃ সাধ্যমত পরিহার করেছি। এ-মনোভাবের স্বাক্ষর ভারতীয় পণ্ডিতদের রচিত অনেক অত্যন্ত মূল্যবান রচনাতেও পরিস্ফুট। স্বভাবতঃই অপর দিকের উগ্র ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবও আমার নেই। শেষোক্ত মনোভাবের একটি বিরক্তিকর অথচ হাস্যোদ্দীপক সুদীর্ঘ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না: "The Hindoos, like the Chinese, have pretended that they are the most ancient people on the face of the earth, and that to them all sciences owe their creation. But it would appear from all recent investigations that these pretensions have no foundation; and in fact no science or useful art (except a rather fantastic architecture and sculpture) can be traced back to the inhabitants of the Indian peninsula prior to the Aryan invasion. This invasion seems to have taken place at some time in the latter half of the fifth century or in the sixth century after Christ, when a tribe of the Aryans entered India by the north-west frontier and established

themselves as rulers over a large part of the country. Their descendants, wherever they have kept their blood pure, may be still recognized by their superiority over the races they originally conquered ; but as is the case with the modern Europeans they found the climate trying, and gradually degenerated."—অর্থাৎ, "চীনাদের মত হিন্দুরাও দাবী করে যে তারাই ভূপৃষ্ঠে প্রাচীনতম জাতি, এবং সব বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে তাদেরই হাতে। কিন্তু আধুনিক কালের যাবতীয় গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, তাদের দাবী ভিত্তিহীন ; আর প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে আর্যাভিযানের আগে পর্যন্ত কোন বিজ্ঞান বা কোন প্রয়োজনীয় শিল্পেরই (কিম্ভূতকিমাকার এক প্রকার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ছাড়া) সূত্রপাত হয়নি। মনে হয় এই আর্যাভিযান সংঘটিত হয় খৃষ্টজন্মের পরবর্তী পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ; তখন আর্যদের এক গোষ্ঠী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই আর্য গোষ্ঠীর বংশধরদের, যেখানে যেখানে রক্তদুষ্টি ঘটেনি, এখনও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে বিজিত জাতিগুলি থেকে পৃথক করা যায় ; কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয়দের মত সে-যুগের আর্যদের কাছেও ওখানকার জলবায়ু অত্যন্ত পীড়াদায়ক ঠেকেছে আর ধীরে ধীরে তাঁদের অপজাত্য ঘটেছে।" পণ্ডিত-পুংগবের নাম রাউস বল (Rouse Ball), গ্রন্থ

'এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অফ্ দি হিষ্ট্রী অফ্ ম্যাথম্যাটিক্স্'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের যে-কোন প্রচেষ্টা ও তৎপরতার ইতিহাস সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিধৃত— ইতিহাসের এই রূপকে আমি গ্রহণ করেছি। বর্তমান রচনায় তাই প্রত্যক্ষভাবে গণিতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন অনেক তথ্যের অবতারণা। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীটি মূলতঃ কার্ল মার্কসের। 'ম্যান মেকস্ হিমসেলফ্' গ্রন্থে গর্ডন চাইল্ড (Gordon Childe) বলেন: "Marx insisted on the prime importance of economic conditions, of the social forces of production, and of applications of science as factors in historical change. His realist conception of history is gaining acceptance in academic circles remote from the party passions inflamed by other aspects of Marxism." অর্থাৎ, "ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক অবস্থা, উৎপাদনের পিছনের সামাজিক শক্তি এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগের যে চরম গুরুত্ব রয়েছে, মার্কস তা খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। মার্কসের মতবাদের অন্যান্য অংশ থেকে যে তীব্র দলীয় মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে তার আওতার বাইরের বিদ্বৎসমাজেও মার্কস পরিপোষিত ইতিহাসের এই বাস্তবানুগ রূপ ক্রমশঃ স্বীকৃতি পাচ্ছে।"

তৃতীয়তঃ, আমি স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিয়েছি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ এমন এক বিচিত্র সৃষ্টিছাড়া দেশ ছিল না, যেখানে

সব কাজের পিছনের সব প্রেরণাই ছিল মূলতঃ ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক। তাই, জ্যামিতি, বীজগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার উৎকর্ষের কারণ হিসাবে যাগযজ্ঞের তাগিদ ছাড়া অন্য সম্ভাব্য ঐহিক কারণেরও উল্লেখ বা আলোচনা করেছি।

ইংরেজী ভাষা কিছুমাত্র জানেন না এমন পাঠকেরও বর্তমান রচনা সর্বাংশে বুঝতে পারার কথা। রচনার সর্বত্র বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছি; কিন্তু পারিভাষিক শব্দগুলির পাশে প্রায়ই ইংরেজী প্রতিশব্দেরও উল্লেখ করেছি। আমার ধারণা তাতে ইংরেজী-জানা পড়ুয়া পাঠকদের সুবিধা হয়। অনুরূপ কারণেই যে-পাশ্চাত্য নামগুলি খুব সুপরিচিত নয় সেগুলি প্রথমবার ব্যবহার করার সময়ে, পাশে বন্ধনীর মধ্যে, ইংরেজী বানানও নির্দেশ করা হয়েছে। ব্যবহৃত সব উদ্ধৃতিগুলির বাংলা অনুবাদ দেওয়া আছে; এ-ব্যপারে উল্লেখ্য এই যে, অনুবাদকার্যে ভাবকেই প্রাধান্য দিয়েছি, আক্ষরিক ভাষাকে নয়।

সংখ্যার প্রতীকের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও তথাকথিত আরবী প্রতীক—অর্থাৎ 1, 2, 3 ইত্যাদি—ব্যবহার করেছি, বিশেষ করে বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির আলোচনায়। অন্যত্র—সাধারণ বা পাটীগণিত প্রভৃতির আলোচনায়—বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত প্রতীকই ব্যবহার করা হয়েছে। এ-রীতি, আশা করি, বাঙালী পাঠকের কাছে বিসদৃশ ঠেকবে না কারণ, আমার বিশ্বাস, বাংলায় গণিত-আলোচনার এটাই এখনও অধিক প্রচলিত রীতি।

উচ্চতর গণিতজ্ঞান এ-রচনা বোঝার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়

নয় বলেই আমার বিশ্বাস—স্কুল পাঠ্য-বহির্ভূত সব গাণিতিক ধারণারই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী ব্যাখ্যা এ-রচনার মধ্যেই পাওয়া যাবে।

এই গ্রন্থে 'ভারত' বলতে 'অবিভক্ত ভারত' এবং 'হিন্দু' বলতে দু'-এক জায়গা ছাড়া সব ক্ষেত্রেই ধর্ম নির্বিশেষে 'প্রাচীন ভারতীয়'দের বুঝিয়েছি। 'হিন্দু' শব্দের অর্থ আদিতে ভারতীয়ই ছিল। আর, 'জ্যোতিষ' কথাটা ব্যবহার করেছি 'জ্যোতির্বিজ্ঞান'-এর সমার্থক হিসাবে, যেমন ব্যবহার হ'ত প্রাচীন ভারতবর্ষে। আজকাল অবশ্য সাধারণতঃ শব্দ দু'টি (যথাক্রমে Astrology ও Astronomy-র মত) সম্পূর্ণ দু'টি পৃথক বিষয়কে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

কয়েকটি ত্রুটির বিষয়ে সচেতন আছি। ভাষা অনেক জায়গায় তথ্য-সর্বস্ব, নীরস হয়েছে; আর, বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে লেখার ফলে, বানান বা শব্দনির্বাচনের ক্ষেত্রে নবীনের সঙ্গে কোথাও কোথাও প্রাচীনের সহাবস্থান ঘটেছে। ভারতবর্ষের গাণিতিক উৎকর্ষের সঙ্গে সমসাময়িক বা অনুরূপ কালের মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক প্রভৃতি উৎকর্ষের সামান্য কিছু তুলনা কোথাও কোথাও করেছি। এ-আলোচনা আরো অনেক বিস্তৃত, গভীর ও তথ্য-সমৃদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। এ-ত্রুটির কারণ ঐ-বিষয়ে আমার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞান। অনুরূপ কারণেই মহাচীনের প্রাচীন গাণিতিক উৎকর্ষের প্রায় কোনও উল্লেখই করা যায়নি। সুযোগ পেলে এ-ত্রুটিগুলো বারান্তরে শুধরে নেবার চেষ্টা করব।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সম্পর্কে গঠন-মূলক কোন সমালোচনা পেলে কৃতজ্ঞ বোধ করব। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব-কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ—ওঁদের তরফ থেকে কিছুটা তাগিদ না থাকলে লেখাটা বোধহয় কোনদিনই শেষ হ'ত না।

বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম্
কলকাতা
৪ঠা এপ্রিল, '৬৫।

—রমাতোষ সরকার

অবতরণিকা

ইতিহাস ঃ গণিত

॥ ইতিহাস ॥

ভারত-সভ্যতা অথবা সাধারণভাবে মানব-সভ্যতা কত প্রাচীন, কবে কোথায় কি ভাবে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল ভারত তথা পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র? প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যে-কোন অংশ নিয়ে চিন্তা করতে গেলে, গোড়াতেই এ-প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু, ইতিহাস-লক্ষণাক্রান্ত এ-প্রশ্নগুলির উত্তর ইতিহাস থেকে কোনও মতেই পাওয়া যাবে না। কারণ, ইতিহাসেরও একটা ইতিহাস আছে, আছে সে-ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ বা সুরু; আর, উল্লিখিত প্রশ্নগুলি হচ্ছে সুরুরও আগের প্রসঙ্গে, অতএব তা ইতিহাস-বহির্ভূত। তাছাড়া, কথিত প্রশ্নগুলি ঠিক 'কবে কোথায় নেপোলিয়নের জন্ম হয়েছিল?'-জাতীয় প্রশ্ন নয়, এগুলি এমন প্রকৃতির যার সঠিক ও চূড়ান্ত উত্তর হয় না।

কিন্তু, ইতিহাস-বহির্ভূত বলেই কোন প্রশ্ন কিছু অনুসন্ধিৎসা-বহির্ভূত হয়ে থাকতে পারে না। আর, সঠিক ও চূড়ান্ত উত্তর পাবার সম্ভাবনা না থাকলেও জিজ্ঞাসু মনে মোটামুটি একটা উত্তর পাবার দাবী থেকে যায়। উল্লিখিত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে এ-দাবী মিটেছে। মিটিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌রা। এঁদের মতে পাঁচ থেকে আড়াই লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম 'মানুষ' পদবাচ্য জীবের আবির্ভাব হয়।

সে-মানুষের সঙ্গে বন্য পশুর জীবন-নির্বাহ প্রণালীর অল্পই তফাৎ ছিল; কিন্তু, সে-মানুষ নিঃসন্দেহে ছিল মানুষই—আজকের সুসভ্য মানুষের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ।

তখনকার প্রাণীজগতে এদের অন্যতম প্রধান, সম্ভবতঃ প্রধানতম, বৈশিষ্ট্য ছিল 'ভাষা'—অত্যন্ত অপরিণত, অপুষ্ট, দুর্বল এক কথ্য ভাষা যার পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করতে হ'ত নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মননক্রিয়ার প্রধান অবলম্বন ভাষা আর আজকের মানুষের সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের যা জন্মদাত্রী ও ধাত্রী সেই বিমূর্ত চিন্তা বা abstract thinking-এর বীজ নিহিত আছে ভাষার মধ্যে। বস্তুতঃ ভাষা-সৃষ্টির মধ্যেই বিমূর্ত চিন্তা কাজ করছে। গর্ডন চাইল্ড-এর ভাষায়: "To name a thing at all is an act of abstraction. The bear, on getting its name, is thereby picked out and isolated from the complex of sensations—trees, caves, twittering birds, etc.—with which it may be accompanied when actually confronting a man. And it is not only isolated, but also generalized. Actual bears are always individual; they may be big or little, black or brown, sleeping or climbing a tree. In the word "bear", such qualities, some of which would apply to any actual bear, are ignored, and attention is drawn to one or two common elements, characteristics that have been found to be common to a number of

distinct individual animal."—অর্থাৎ, "কোন কিছুকে নাম দিলেই বিমূর্ত করা হয়। ভাল্লুক, তার নাম পাওয়া মাত্র, অনুভূতির এক জট থেকে মুক্ত এবং বিশ্লিষ্ট হয়েছে—গাছ, গুহা, পাখীর ডাক প্রভৃতির অনুভূতি—যে অনুভূতির সঙ্গে, মানুষের চোখে পড়ার সময়ে হয়তো সে যুক্ত ছিল। আর শুধু বিশ্লিষ্টই নয়, নির্বিশিষ্টও বটে। আসল ভাল্লুক তো সব সময়ে বিশিষ্ট ; বড় নয় তো বা ছোট, কাল নয় তো বা বাদামী, ঘুমন্ত নয় তো বা গাছে-চড়া। "ভাল্লুক" শব্দটার মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য, যার কোনটা না কোনটা প্রত্যেক আসল ভাল্লুকের আছেই, সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। এর মধ্যে স্থান পেয়েছে শুধু দু'-একটি সাধারণ গুণ, যা পরিদৃষ্ট বেশ কিছু আলাদা, বিশিষ্ট ভাল্লুকের মধ্যে বা তত্তমণীভাবে দেখা যাচ্ছে।"

আদিম মানুষের ইতিহাসের প্রথম যুগকে [illegible] প্রস্তর যুগ বা Paleo-lithic Age বলা হয়। এ-যুগের মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া পাথরের টুকরোকে সামান্য ঘষে মেজে নিত—সেটাই ছিল তার একমাত্র হাতিয়ার, আত্মরক্ষায় ও শিকারে একমাত্র অস্ত্র। শিকার, মাছধরা ও ফলমূল-সংগ্রহ দ্বারা প্রকৃতি থেকে সরাসরি আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অর্জন করাই ছিল এদের উপজীবিকা। এরা সম্ভবতঃ আগুন সৃষ্টি করতে পারত, কিন্তু তার বিশেষ ব্যবহার জানত না। খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ্ মর্গ্যান (Morgan) এ-অবস্থাকে বন্যতা বা Savagery বলেছেন ; অর্থনৈতিক দিক থেকে এ-অবস্থা খাদ্য-সংগ্রাহক বা food-gathering পর্যায়ের। এর পর

আসে নব্য-প্রস্তর যুগ বা Neo-lithic Age, প্রথম আসে সম্ভবতঃ তথাকথিত নিকট প্রাচ্যে। এটা আনুমানিক দশ হাজার বছর আগেকার কথা। এ-যুগেও হাতিয়ার প্রস্তরাস্ত্র কিন্তু তা অনেক মসৃণ, তীক্ষ্ণ ও কলাকৌশলে নির্মিত। এ-সময়ে মানুষ কৃষি ও পশুপালন মাধ্যমে খাদ্য-উৎপাদন করতে পারত। এই সময়েই মৃৎপাত্র নির্মাণ সুরু হয়। খাদ্যের অনিশ্চয়তা অনেকটা দূর হওয়ায় এ-যুগে কিছু কিছু স্থায়ী বাসস্থান ও গ্রামও গড়ে ওঠে। কৃষির প্রয়োজনে এ-কালে সেচ-কার্যের সুরু হয়। এ-অবস্থাকে মর্গ্যান বলেছেন বর্বরতা বা Barbarism. অর্থনীতিতে এটা খাদ্য-উৎপাদক বা food-producing অবস্থা।

এর পর আসে তাম্র যুগ বা Copper Age এবং তারই পরিণতি রূপে ব্রোঞ্জ যুগ বা Bronze Age। এটা হাজার ছয় বছর আগেকার অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব ৪০০০ বছরের কাছাকাছি সময়ের কথা। এর প্রথম উদ্ভব হয় মিশরে নীলনদের অববাহিকায়, ইরাকে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিশ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল সুমেরিয়ায় এবং হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং-বিধৌত চীন দেশে—আর, অনুরূপ সময়ে বা সামান্য কিছু পরে ভারতবর্ষে সিন্ধুনদের উপত্যকায়। মর্গ্যান এই অবস্থাকে সভ্যতা বা Civilization আখ্যা দিয়েছেন। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই পৌর-সভ্যতা বা urban civilization-এর সুরু। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে তামা ও ব্রোঞ্জ অর্থাৎ তামা ও টিনের মিশ্রণে উৎপন্ন এক রকমের ধাতু ছিল হাতিয়ার ও তৈজসপত্র

প্রভৃতি প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ। এর জন্য প্রয়োজন ছিল রাসায়নিক জ্ঞানের। তাছাড়া এই সময়ে কৃষি- ও ধাতুশিল্প-উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় প্রথার প্রচলন হয়। ফলে সমাজে উদ্ভব হয় নতুন কয়েকটি শ্রেণীর যাদের খাদ্যোৎপাদনের দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। শেষোক্ত শ্রেণীতে ছিল প্রধানতঃ ধাতু-বিশারদ ও নানাপ্রকারের কারিগর আর উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়কারী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। প্রয়োজনের তাগিদে এ-সময়ে প্রাচীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার—লিপি-আবিষ্কার সম্ভব হয়, জন্ম নেয় লিপিকার—হিসাবরক্ষক ও কারণিক শ্রেণী। এ-কালে নানাপ্রকার মাপজোখের প্রণালী ও উপকরণ উদ্ভাবিত হয়। এই যুগে ক্রমে ক্রমে খনি-অঞ্চলে ও নদীর কাছাকাছি নগর এবং নগর-সমবায়ে রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে, সৃষ্টি হয় রক্ষক ও শাসক শ্রেণীর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ব্রোঞ্জ যুগ থেকে কিছু কিছু ইতিহাসের লিখিত উপাদান সঞ্চিত হ'তে থাকে।

এর-পর আসে লৌহ-যুগ বা Iron Age। খৃষ্ট-পূর্ব প্রায় ১২০০ অব্দ থেকে লৌহ ব্যবহারের ব্যাপকতা, সুরু তারও কিছু আগে। এক অর্থে এ-যুগ এখনও বর্তমান। কিন্তু, এ-যুগের আগেই সভ্য সমাজের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতভূমিতে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে কিছু কিছু প্রত্নপ্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী সম্প্রদায় সম্ভবতঃ এই যুগের মানুষের প্রত্যক্ষ বংশধর। নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে প্রধানতঃ

দাক্ষিণাত্যের নানা জায়গায়, বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলে ও উত্তর প্রদেশে। বর্তমান কালের কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীরা সম্ভবতঃ নব্য-প্রস্তর যুগের ভারতীয়দের ধারাবাহী উত্তর পুরুষ। নব্য-প্রস্তর যুগের অবসানে যে-সভ্যতা ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করে তার নাম দ্রাবিড় সভ্যতা। এ-সভ্যতা সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জ-সভ্যতা। দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাভাষীরা প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার উত্তরাধিকারী। দ্রাবিড়রা সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ঐ-পথেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সবশেষ স্তরে ভারতে প্রবেশ করেন আর্যজাতি। উত্তর-পূর্ব গিরিপথ ধরেও প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভারতে অনেক উপজাতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এঁরা সাধারণভাবে তিব্বতীয়-ব্রহ্ম বা Tibeto-Burman নামে পরিচিত। নেপালী, ভুটিয়া, নাগা, কুকি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

॥ গণিত ॥

কোন দেশের গাণিতিক ধারাকে বুঝতে হ'লে প্রথমে সাধারণভাবে গণিত এবং গণিতের উদ্‌বর্তন সম্পর্কে কতকগুলি কথা জেনে নেওয়া বা স্মরণ করা দরকার।

প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল গণিতের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন : "...mathematics is the science in which we do not know what we are talking about, and do not care whether what we say about it is true."—অর্থাৎ, "গণিত হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যে-বিজ্ঞানে আলোচ্য বস্তুগুলির স্বরূপ আমাদের জানা নেই, আর আলোচনা বাস্তব-সম্মত কিনা তা নিয়েও কোন মাথা ব্যথা নেই।" সংজ্ঞাটি সূক্ষ্ম, সংক্ষিপ্ত—গভীর ভাবসমৃদ্ধ। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করার পূর্ব শর্ত উচ্চতর গণিতজ্ঞান। কিন্তু একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বোধ হয় সবার কাছেই ধরা পড়ে—সে-ইঙ্গিত গণিতের নির্বিশেষ বা generalised এবং বিমূর্ত বা abstract রূপ সম্বন্ধে। গণিত সম্পর্কে সমসাময়িক কালের আরও অনেক চিন্তানায়কের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে গণিতের ঐ একই নির্বিশেষ এবং বিমূর্ত রূপের কথাই পাওয়া যায়। কিন্তু আজ খৃষ্টোত্তর বিংশ শতাব্দীতে গণিত, যা প্রায় মানব-সভ্যতার সমবয়সী, যে-রূপ পরিগ্রহ করেছে, খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্বে, তার শৈশবে গণিতের সে-রূপ ছিল না। আজকের গণিতশাস্ত্র যদিও পুরোপুরি যুক্তি-আশ্রয়ী, কিন্তু তা অনেক পরিমাণে বাস্তব-নিরপেক্ষ। বর্তমানে গণিতের এমন অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে, যেগুলির উন্নতি ও বৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে কোনদিন মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামপ্রদ করে তুলতে সাহায্য করবে এমন আশা সুদূর পরাহত। এক অর্থে তাই আজকের অনেক

গণিত-চিন্তা 'গণিতের জন্যই গণিত-চিন্তা'-রই নামান্তর। কিন্তু দূর অতীতে, মানব সভ্যতার উষাকালে মানুষের জীবনে এই গণিত-বিলাসের কোন অবকাশই ছিল না। সেযুগের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে আজকের মানুষের জীবন প্রণালীর মহাসমুদ্র প্রমাণ পার্থক্য। তখন মানুষের শক্তি ও বুদ্ধির প্রায় সব রকম ব্যবহারের মুখ্য ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল একটি—প্রাণরক্ষা। শুনতে চমকপ্রদ হ'লেও এ-কথা সত্যি যে, রাসেল-বর্ণিত নির্বিশেষ, বিমূর্ত শাস্ত্রটির সূত্রপাত হয়েছে সেই যুগেই, যখন মানুষ তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বাঁচা-মরার সংগ্রামে ব্যস্ত।

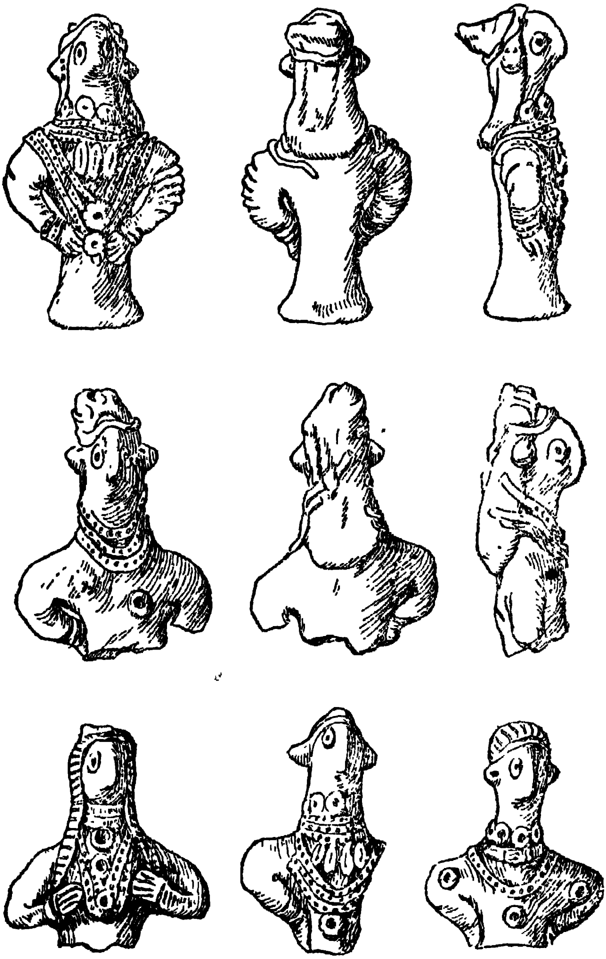
পরিমাণ বা সংখ্যার ধারণা আর আকার ও আকৃতির ধারণা গণিতশাস্ত্রের মূল ধারণাগুলির মধ্যে প্রধান। আর এ-ধারণা দু'টি মানুষের চিন্তায় স্থান পেয়েছে—স্থান করে নিয়েছে তার জীবন-ইতিহাসের আদি যুগে। ভাষা মানুষের ভাবের বাহন; কিন্তু আমরা যে অর্থে সাধারণতঃ 'ভাষা' শব্দটিকে ব্যবহার করি সে-অর্থে ভাষা কেবলমাত্র মানুষের গুণগত বা বর্ণনামূলক ভাবের বাহন। পরিমাণগত বা পরিমাপমূলক ভাবের আদান-প্রদান করতে প্রয়োজন হয় অন্য এক ভাষার, আর সে-ভাষা গণিতের অঙ্গ। তাই, সেই প্রস্তর যুগে বা তারও আগে মানুষ তার নিজের গোষ্ঠীর সাথীদের যখন শত্রুর আগমনবার্তা জানাবার জন্য ব্যবহার করেছে তার আদিম ভাষা, তখন সেই একই সঙ্গে শত্রু সংখ্যায় বেশী না কম তা বোঝাবার জন্য আদিম গণিতকে তার দরকার হয়েছে। আবার,



প্রস্তর যুগে অঙ্কিত চিত্র—আদিম মানুষের আকার-আকৃতি-জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করছে

আদিম মানুষ যখন তার যুক্তিহীন বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে তুক-তাকের আশ্রয় নিত—শিকার-লাভের ও শিকারে সাফল্য-লাভের অনিশ্চয়তা দূর করার মানসে অভীষ্ট পশুর প্রতিকৃতি সৃষ্টি করত, তাকে অস্ত্রবিদ্ধ করত অথবা জমি এবং পালিত পশু-পক্ষীর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে নারীমূর্তি নির্মাণ করত—তখন আকার ও আকৃতির জ্ঞান তার কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশ ও কালের সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে গণিতের



আদিম মানুষের আকার-আকৃতি-জ্ঞানের পরিচয় বাহক নারীমূর্তি

উৎকর্ষ এক নিবিড় যোগসূত্রে গ্রথিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে গণিতের একটি বিশেষ শাখা জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা বিবেচনা করা যেতে

পারে। পঞ্জিকা-প্রণয়ন এ-বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক ও গুরুত্ব-পূর্ণ সোপান। কাল বা সময়ের ধারণা মানুষের প্রাথমিক ধারণাগুলির মধ্যে একটি। উপলব্ধি করার ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ উপলব্ধি করেছে যে জগৎ পরিবর্তনশীল, আর এই পরিবর্তনশীলতার পটভূমিকায় চিনেছে প্রবহমান কালকে। কৃষি-আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এই প্রবহমান কালকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন আদিম মানুষ বিশেষ অনুভব করেনি; কিন্তু পরবর্তীকালে কৃষি-নির্ভর সমাজ-ব্যবস্থায় কাল-নির্ধারণ ও কাল-চক্রে ঋতু-আবর্তনের সূত্র আবিষ্কার বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় যে আদিম মানবসমাজে কৃষিজীবী অধিবাসীদের মধ্যে একপ্রকার প্রাথমিক পঞ্জিকার জ্ঞান ছিল কিন্তু কৃষি-অনভিজ্ঞ শিকার-জীবী জাতির মধ্যে এমন কি আরো পরবর্তী কালেও সেরূপ কোন জ্ঞান ছিল না।

দিন-রাত্রির পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন পঞ্জিকা-প্রণয়ন-প্রয়াসী আদিম কৃষিজীবী মানুষের দৃষ্টিতে স্বভাবতঃই বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত কাল তাই প্রথম থেকেই সময়ের একক হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে চন্দ্রকলার নিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধির সূত্র আবিষ্কৃত হয়, আবিষ্কৃত হয় যে দুই অমাবস্যার বা দুই পূর্ণিমার অন্তর্বর্তী সময়ে প্রায় ত্রিশটি সূর্যোদয় ঘটে। তখন সময় মাপের দিন অপেক্ষা দীর্ঘতর একক পাওয়া গেল—মাস, আর তার সাহায্যে ঋতুচক্রের হিসাব রাখা অনেক সহজসাধ্য হ'ল। এইভাবে ক্রমশঃ প্রাচীন ভারতীয় ও অন্যান্য জাতিদের মধ্যে

দিন, মাস ও বৎসরের ধারণা জন্মেছিল আর সেই সূত্রে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান।

নব্য-প্রস্তর যুগে খাদ্য-উৎপাদন-পদ্ধতি আয়ত্ত করার পর, আদিম মানুষ যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করে এক জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস সুরু করে। এই সময় থেকে গৃহাদি নির্মাণ ও সেচ সংক্রান্ত পূর্ত-কার্যের সুরু। আদিম মানুষের জ্যামিতিক জ্ঞানের বিশেষ প্রসার হয় এই আদিম পূর্তবিদ্যার প্রয়োজনে ও কল্যাণে। আরও পরের যুগে যখন ক্রমশঃ বিনিময় প্রথা, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রচলন হয় তখন সাধারণ-ভাবে গণিতের ও বিশেষভাবে পাটীগণিতের প্রভূত উন্নতি হয়।

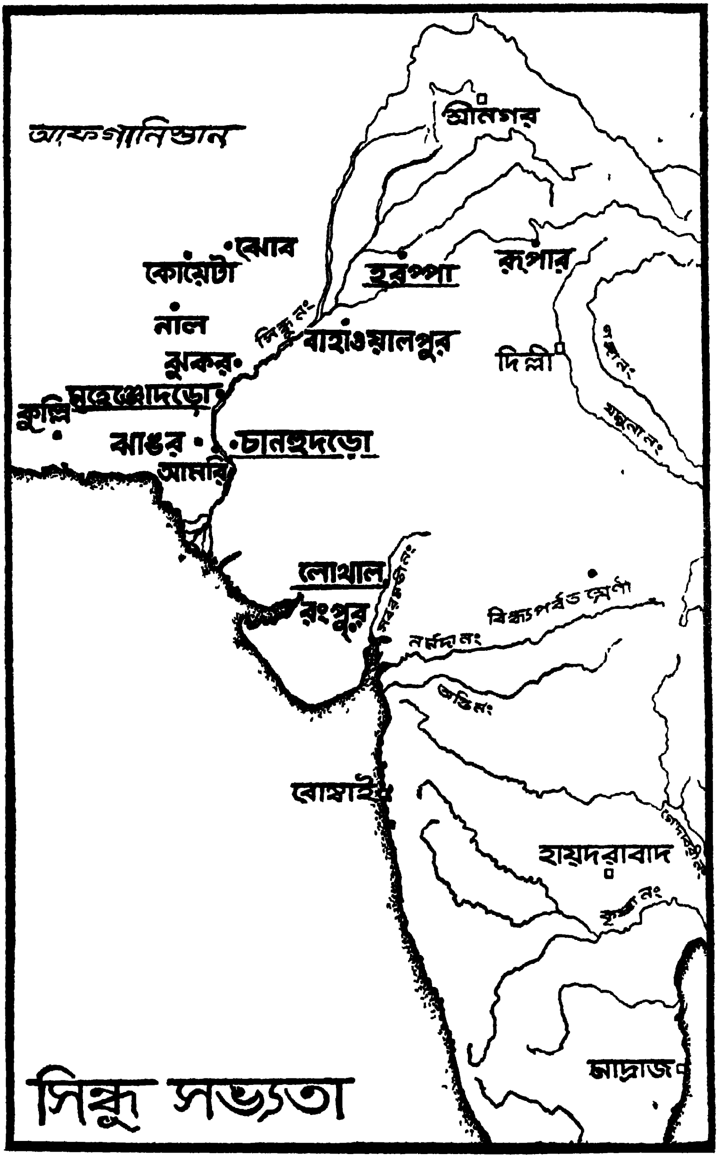
প্রাকৃতিক শক্তিগুলিতে দেবত্ব আরোপ করে তাদের তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা করা সমস্ত প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত ছিল। আত্মরক্ষার প্রেরণায় এবং কল্যাণ ও শ্রী বৃদ্ধির কামনায় সে-যুগের মানুষ পূজার্চনার বিভিন্ন মনগড়া প্রক্রিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত। পরবর্তীকালে ক্রমশঃ এই একান্ত জৈবিক প্রয়োজনবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আধ্যাত্মিক প্রেরণা। প্রাচীন ভারতে এই জাতীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুনির্দিষ্ট আকার-আকৃতির বেদী নির্মাণ করা হ'ত এবং আকাশে জ্যোতিষ্ক সংস্থানের সাহায্যে বিশ্বাস বা অভিজ্ঞতামত শুভাশুভ লগ্ন নির্ধারণ করা হ'ত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতির পক্ষে, ঐ বেদী নির্মাণ ও লগ্ন নির্ণয় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

প্রাক্‌-বৈদিক যুগ

পটভূমিকা ঃ সভ্যতা ও গণিতজ্ঞান

॥ পটভূমিকা ॥

ভারতভূমিতে সভ্যতা-বিকাশের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় সিন্ধুনদের উপত্যকায়। সেখানে খননকার্যের ফলে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেগুলি পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ৩৫০০ বা ৩০০০ অব্দের অনুরূপ সময়ে সেখানে এক সভ্যতার উন্মেষ হয়। পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো ও চান্‌হূদড়ো ছিল এ-সভ্যতার অন্যতম প্রধান পীঠস্থান। (পর পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য।) প্রাচীন নগরী হরপ্পার অবস্থানের কথা প্রথম জানা যায় গত শতাব্দীর শেষার্ধে, জানতে পারেন দুর্ভাগ্যক্রমে উইলিয়াম ব্রাণ্টন (William Brunton) নামে জনৈক ইংরেজ যিনি তখন ঐ অঞ্চলে মূলতান-লাহোর রেলপথ নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধান করছিলেন। ইঁট-কাঠ-পাথরের প্রয়োজনে এই ক্ষণজন্মা সুসভ্য কর্মবীর হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেন ; ইনি প্রেরণা পেয়েছিলেন সম্ভবতঃ সুযোগ্য ভ্রাতা জন ব্রাণ্টন (John Brunton)-এর কাছ থেকে, যিনি অনুরূপ কাজে ইতিপূর্বে অন্যত্র একটি ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ব্যবহার করেছিলেন। হরপ্পার মূল্যবান ঐতিহাসিক পরিচয় প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ দয়ারাম সাহ্‌নী। মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কৃত হয় ১৯২২ সালে,


আফগানিস্তান
শ্রীনগর
ঝোব
কোয়েটা
হরপ্পা
রূপার
নাল
সিন্ধু নং
বাহাওয়ালপুর
দিল্লী
ঝুকর
মহেঞ্জোদড়ো
কুল্লি
ঝাঙর
চানহুদড়ো
আমরি
লোথাল
রংপুর
বিন্ধ্যপর্বত শ্রেণী
নর্মদা নং
বোম্বাই
হায়দরাবাদ
কৃষ্ণা নং
মাদ্রাজ
সিন্ধু সভ্যতা

আবিষ্কার করেন স্বনামধন্য ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। চানহূদড়ো আবিষ্কার করেন ইংরেজ গবেষক-ঐতিহাসিক এরনেষ্ট ম্যাকে (Ernest Mackay)।

প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার পরবর্তীকালে সিন্ধু-প্রদেশের বহু স্থানে সিন্ধু-সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। আরো পরে এ-সভ্যতার স্বাক্ষর প্রায় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় পরিদৃষ্ট হয়েছে। অল্প কিছুকাল আগে বোম্বাইয়ের লোথাল্, বাংলার বেড়াচাঁপা প্রভৃতি দূর দূর অঞ্চলেও সিন্ধু-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতাকে দ্রাবিড়-সভ্যতারই একটি রূপ বলে মত প্রকাশ করেছেন। দ্রাবিড়রা ছিলেন প্রাক্-আর্যভারতের প্রধান অধিবাসী, আর এঁদের মতে, আর্যদের মত দ্রাবিড়রাও বাইরে থেকে ভারতবর্ষ আসেন—আসেন উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ধরেই। স্মরণীয় যে, এখনও বেলুচিস্থানের ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী 'ব্রাহুই' জাতির লোকেরা যে-ভাষায় কথাবার্তা বলেন, তা মূলতঃ দ্রাবিড ভাষা। এ-মতানুসারে দ্রাবিড়রা প্রথমে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাস করতেন; পরে আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হ'য়ে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে অপসরণ করেন। লোথাল্ ও বেড়াচাঁপায় প্রাপ্ত সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন এবং দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়জাতির উপস্থিতি এই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে কিছুটা সাহায্য করে।

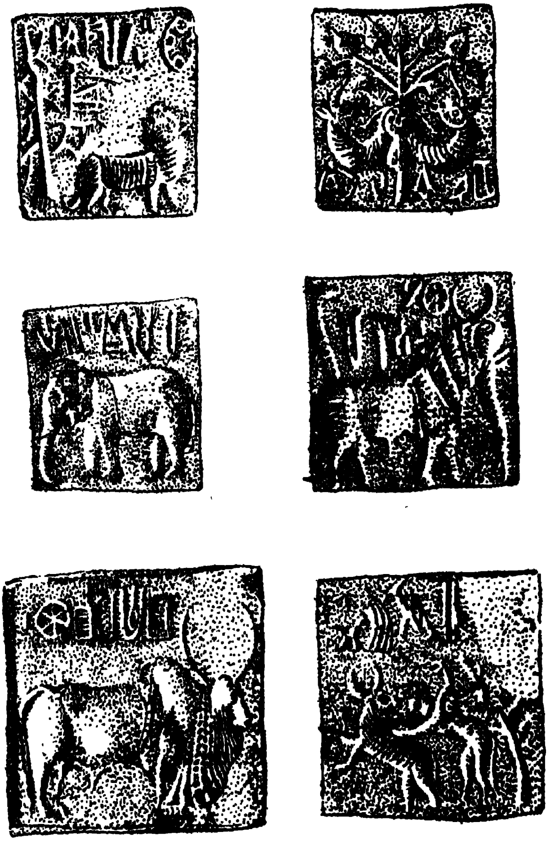
পশ্চিম এশিয়ার সুপ্রাচীন সুমের-সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। স্মরণীয় যে, প্রাচীন সুমের ছিল মেসোপটেমিয়া বা বর্তমান ইরাকের নিম্নভাগে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে; পৃথিবীতে সভ্যতার প্রথম লীলাভূমি বলতে, মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পাকে বাদ দিলে, সুমের, মিশর ও চীনকেই বোঝায়। সিন্ধু-সভ্যতার উদ্ভব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বিরোধী মত ও বিশ্বাস প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ঐতিহাসিক ম্যাকডোনেল্ (Macdonell)-এর মতে—ভারতবর্ষে এই সভ্যতা সুমের থেকে আমদানি হয়; পক্ষান্তরে, হল্ (Hall) মনে করেন, এই সভ্যতার আদি জননী ভারতবর্ষ।

সম্ভবতঃ, খৃষ্ট-জন্মের হাজার দুই-আড়াই বছর আগের কোনও এক সময়ে সিন্ধু-সভ্যতার অবসান ঘটে। খুব সম্ভব, বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগের ফলে সিন্ধুদেশ পরিত্যক্ত হয়। কেউ কেউ আর্যজাতিকে এই বহিঃশত্রু বলে মনে করেন।

সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে সুমের-সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—সে-সম্পর্ক উত্তমর্ণের হোক বা অধমর্ণেরই হোক—সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু, এ-সভ্যতা যে ভৌগলিক ছাড়া অন্য অর্থেও একান্তভাবে ভারতীয় সে-কথাও স্থিরনিশ্চিত। পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা, বেদোত্তর সভ্যতা তথা আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতা ধারাবাহিকতার সূত্রে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। সিন্ধু-সভ্যতায় উপাস্য দেবদেবীদের

সঙ্গে বর্তমান হিন্দু দেবদেবীর অনস্বীকার্য সাদৃশ্য আছে। এ-প্রসঙ্গে 'প্রিহিস্টরিক ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে স্টুয়ার্ট পিগট্ (Stuart Piggott) লিখেছেন : "The numerous clay figurines of women suggest that…there was some form of worship of a Mother-Goddess…. Such goddesses are common in the Hinduism of the countryside today—the *gramdevatas* of many a rustic shrine ;… And this is not the only link with contemporary Hinduism. There is more than one representation on seals from Mohenjo-daro and Harappa of a male god,…. There can be little doubt that we have here the prototype of the great god Shiva …. There is also evidence of some form of…tree-worship in which a deity is shown in the branches of the sacred fig tree or *pipal*, still regarded as a holy tree…. The seal representations again show what must be sacred animals—such as the humped bull, whose privileged position today, as he noses his way unmolested through the bazaars, helping himself to whatever takes his holy fancy, must date back to the third millennium B. C. on the banks of the Indus and the Ravi."—অর্থাৎ, "অসংখ্য মৃন্ময় নারীমূর্তি থেকে মনে হয় যে…মাতৃরূপে দেবতা-পূজার এক ধারা প্রচলিত ছিল…। অনেক গ্রাম্য মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত গ্রামদেবতা হিসাবে এমন মাতৃ-দেবী এখনও গ্রামাঞ্চলে

হিন্দু ধর্মের অঙ্গ; ...আর বর্তমান কালের হিন্দুধর্মের সঙ্গে এটাই একমাত্র যোগসূত্র নয়। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত শীলমোহরে এক পুরুষ দেবতার একাধিক প্রতিকৃতি পাওয়া



মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় প্রাপ্ত কতকগুলি শীলমোহর

গেছে,…। এটা যে মহাদেব শিবের পূর্বরূপ তাতে বোধ হয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই…। বৃক্ষ-পূজারও…একপ্রকার নিদর্শন পাওয়া গেছে, পবিত্র বট বা পিপ্পল গাছের শাখায় দেবতার অধিষ্ঠান দেখে; বট বা পিপ্পল গাছ এখনও পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। …শীলমোহর থেকে কোন্ কোন্ পশু পবিত্র তা'ও বোঝা যায়, যেমন—কুঁজওলা ষাঁড়; এখনও যে ওদের একটা মর্যাদার ভূমিকা আছে, বর্তমান কালেও বাজারের মধ্য দিয়ে বিনা বাধায় যা কিছু ওদের পবিত্র রুচিকে আকর্ষণ করে তাই খেতে খেতে ওরা যে চলে যায়, তার প্রচলন সুরু হয়েছে সিন্ধু ও ইরাবতীর তীরে সেই খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকে।"

এ-ছাড়া অলংকার-নির্মাণ, পরিমাপ-নির্ণয় প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাপারেও আধুনিক ভারতবর্ষের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার ভারতের বিচিত্র সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

॥ সভ্যতা ও গণিতজ্ঞান ॥

মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রাক্-বৈদিক ভারতবর্ষের নাগরিক জীবন, খাদ্য, পরিধেয়, শিল্প, বাণিজ্য, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে, এক কথায় সমগ্র সিন্ধু-সভ্যতা সম্পর্কে, বেশ কিছুটা ধারণা ও সিদ্ধান্ত করা যায়।

সে-যুগের সিন্ধুবাসীদের সৃষ্ট নগরগুলি ছিল আয়তনে বেশ সুপরিসর, অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও স্বাস্থ্যসম্মত। পূর্তকার্যে প্রতিফলিত তাঁদের সৌন্দর্য- ও পৌরকল্যাণ-বোধ অতীব প্রশংসনীয়। আর, নগরের আবর্জনা ও ময়লা জল নিকাশের যে-ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন তা ছিল তুলনাহীন, অতিমাত্রায় বিস্ময়কর। প্রতিটি বাড়ী এবং প্রতিটি পথ ছিল নালাযুক্ত—খোলা নালাগুলি আবার মাঝে মাঝে ভূগর্ভস্থ প্রায় দু' ফুট ব্যাসের নলের সঙ্গে সংযুক্ত। নলগুলি পরীক্ষা এবং পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে কিছুটা তফাতে তফাতে গর্ত করা। আবর্জনা ফেলার জন্য পথের ধারে ধারে বিশেষ আধার থাকত। আর, ময়লাজল-আবর্জনা নিক্ষেপের শেষ ব্যবস্থা ছিল নগরের বাইরে গভীর খাদের মধ্যে। নগরগুলি এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত কতকগুলি সুপ্রশস্ত রাজপথ দ্বারা বিভিন্ন আয়তাকারের পল্লীতে বিভক্ত ছিল। পথের দু'পাশে থাকত ছোটবড় বাড়ীর শ্রেণী। বাড়ীগুলি পোড়া ইটের, এগুলি মসৃণ মেঝের নানা মাপের ঘরে বিভক্ত—কোনটি একতলা, কোনটি বা একাধিক তলার। প্রশস্ত দরজা-জানলা, অনুচ্চ ধাপযুক্ত সিঁড়ি, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ছিল প্রায় সব বাড়ীরই অঙ্গ। প্রাসাদোপম বড় বাড়ীগুলি আবার বাগান ও পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রতিটি গৃহে কূপ, স্নান-কক্ষ ইত্যাদি তো ছিলই আবার সর্বসাধারণের জন্য নগরের মধ্যে কতকগুলি সুবৃহৎ স্নানাগার ও সন্তরণ-ক্ষেত্রও ছিল। এছাড়া নগরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল পুরবাসীদের সভাগৃহ বা প্রার্থনা-মন্দির রূপে

ব্যবহারযোগ্য বিরাট বিরাট কতকগুলি কক্ষ। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কয়েকটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু অন্য কতকগুলি নিদর্শন থেকে মনে হয়—মৃতদেহ দাহ করার প্রথাও ছিল।

কৃষি, পশুপালন ও নানাবিধ শিল্প ছিল সিন্ধু-সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গমই প্রধান; যব ও নানাপ্রকারের ফলও উৎপাদন করা হ'ত। খাদ্য হিসাবে এগুলির সঙ্গে ছিল মাছ, মাংস ও ডিম। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কয়েকটি রন্ধনশালা আবিষ্কৃত হয়েছে; সেখানে সঞ্চিত অথবা অর্ধভুক্ত অবস্থায় পাওয়া খাদ্যসামগ্রী থেকে এ-সব সিদ্ধান্ত করা গেছে।

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নানা আকারের ও নানা প্রকারের অনেকগুলি বাসনপত্র ও গৃহস্থালীর অন্যান্য জিনিষ পাওয়া গেছে—এগুলি পোড়া মাটী, তামা, ব্রোঞ্জ বা রূপার তৈরী। মোষের শিং ও হাতির দাঁতের চিরুনি, ছুঁচ, পাশার ঘুঁটি ও শিশুর খেলনাও অনেক পাওয়া গেছে। সিন্ধুবাসীরা তূলা ও পশমের বস্ত্র ব্যবহার করতেন। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা অত্যন্ত অলংকারপ্রিয় ছিলেন—প্রায় সর্ব অঙ্গে ব্যবহারযোগ্য সুন্দর প্রস্তরখচিত সোনা, রূপা, গজদন্ত প্রভৃতির নানা প্রকারের সংখ্যাহীন অলংকার পাওয়া গেছে। এগুলি সম্পর্কে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংস্থার প্রাক্তন অধিকর্তা স্যর জন মার্শাল (John Marshall) সবিস্ময়ে মন্তব্য করেছেন: "The jewelleries are so well finished and so highly

polished that they might have come out of a Bond street Jeweller's of today rather than from a prehistoric house of 5000 years ago."— অর্থাৎ, "অলংকারগুলি এমন সুনির্মিত এবং এমন সুন্দরভাবে পালিস করা যে ৫০০০ বছর আগের প্রাগৈতিহাসিক কোন গৃহ থেকে ওগুলো যে সংগৃহীত সে-কথা না ভেবে, বণ্ডষ্ট্রীটের কোন আধুনিক অলংকার-বিক্রেতার কাছ থেকে ওগুলি পাওয়া গেছে, এমন মনে করা যেতে পারে।" এ-প্রসঙ্গে জানার কথা এই যে, বণ্ডষ্ট্রীট আধুনিক লণ্ডনের সৌখীন দোকান-পশারের জন্য বিখ্যাত একটি রাস্তার নাম। কয়েকটি দেশের, বিশেষ করে সুমেরের, সঙ্গে সিন্ধুদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যগত যোগাযোগ ছিল, তার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। কুঠার, বর্শা, গদা, ছোরা ইত্যাদি ধাতুনির্মিত কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং তীর-ধনুকও পাওয়া গেছে। কিন্তু এগুলি সংখ্যায় খুব অল্প—সম্ভবতঃ সিন্ধুবাসীরা খুব শান্তিপ্রিয় ছিলেন।

সে-যুগে ভাস্কর্য, মৃৎ-শিল্প, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি ললিতকলারও বিলক্ষণ চর্চা ছিল। প্রাপ্ত অসংখ্য মূর্তি, ছবি, সৌখীন চিত্রিত মৃৎপাত্র, শীলমোহর প্রভৃতি এ-বিষয়ে সিন্ধুবাসীদের বিশেষ নৈপুণ্যের সাক্ষ্য দেয়।

প্রাক্-বৈদিক যুগে সিন্ধু-উপত্যকার ভারতীয়রা যে অনেক বিজ্ঞানে—বিশেষতঃ রসায়ন বিদ্যা, পূর্তবিদ্যা, কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন ধ্বংসাবশেষ থেকে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-যুগের

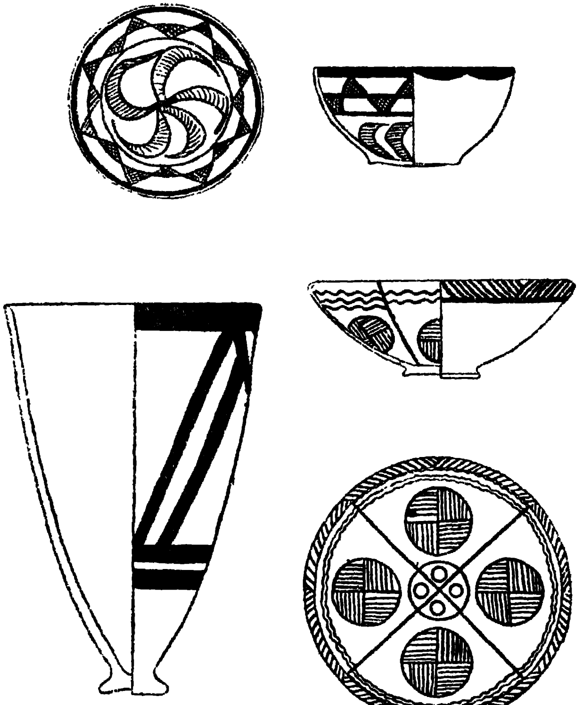
গাণিতিক উৎকর্ষ বা তৎপরতার কোন সুস্পষ্ট স্বাক্ষর, কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ আছে কি? এক কথায় এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসাধ্য। তার প্রথম কারণ এ-বিষয়ে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ নজীরের অপ্রতুলতা। দ্বিতীয় কারণ নিহিত আছে গণিতের চরিত্রের মধ্যে।

প্রাগৈতিহাসিক কোন মানবগোষ্ঠীর রসায়নজ্ঞান বহুলাংশে সঠিকভাবে অনুমান করা যায় তাদের ব্যবহৃত ধাতুদ্রব্য থেকে, কারিগরি বিদ্যার অবস্থা কল্পনা করা যায় প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি বিচার করে—উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে রচিত সমসাময়িক কোন গ্রন্থ লভ্য না হলেও। এ-কথা বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—কিন্তু গণিত সম্বন্ধে নয়। গণিতের উৎকর্ষ বিচারের এই সুবিধা নেই। কারণ বিশুদ্ধাকারে গণিত বিষয়টি ফলিত নয়, তত্ত্ব-প্রধান বা theoretical। গণিতজ্ঞানের আত্মপ্রকাশের কোন সরাসরি পথ নেই, নেই কোন প্রত্যক্ষ মাধ্যম—একমাত্র গাণিতিক রচনা ছাড়া, যা পুরোপুরি লিপি-আবিষ্কার সাপেক্ষ।

কিন্তু গণিতের অপর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি এই যে—সকল বিজ্ঞান, সকল কলাকৌশলের মধ্যে কিছু পরিমাণে গণিত মিশ্রিত আছে। বিজ্ঞান—তা সে বিশুদ্ধই হোক বা ফলিতই হোক, যদি তা প্রকৃতই বিজ্ঞান হয়—গণিতের উপর নির্ভরশীল, কিছুটা গণিতজ্ঞান সাপেক্ষ। গণিতের এই বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করেছেন, স্বীকার করেছেন বহু মনীষী, বহু চিন্তানায়ক—সুপ্রাচীন দার্শনিক প্লেটো থেকে সুরু করে আধুনিক জীববিজ্ঞানী ডারউইন পর্যন্ত।

সিন্ধু-সভ্যতার উচ্চমান, বিস্ময়কর উৎকর্ষের মধ্যে তাই নিশ্চিতভাবে গণিতজ্ঞানের প্রতিফলন আছে—যদিও সে-প্রতিফলন রসায়নাদি ফলিত বিজ্ঞানের প্রতিফলনের মত প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল নয়। সিন্ধু-সভ্যতার গাণিতিক উৎকর্ষের নিদর্শন পরোক্ষভাবে সমগ্র সিন্ধু-সভ্যতা নিজেই।

এই বিশাল বিপুল পরোক্ষ নিদর্শন ছাড়া কিছুটা প্রত্যক্ষ নিদর্শনও অবশ্য আছে। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার নগর-পরিকল্পনা,



মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পায় প্রাপ্ত জ্যামিতিক কারুকার্য খচিত মৃৎপাত্রের অংশ

প্রাপ্ত মৃৎপাত্র, অলংকার, শীলমোহর প্রভৃতির বিচিত্র নক্সা কি পরিমিতিবিদ্যা তথা জ্যামিতির জ্ঞানের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক নয়? মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা-চানহুদড়োর সর্বত্র নানা ওজনের অজস্র বাটখারা পাওয়া গেছে। বাটখারাগুলির অধিকাংশ ঘন বা cube-এর আকৃতি বিশিষ্ট, নিখুঁত ভাবে গঠিত। ছোট থেকে বড় ওজনগুলির পারস্পরিক অনুপাত যথাক্রমে ১, ২, $\frac{৮}{৩}$, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০, ৩২০০, ৬৪০০, ৮০০০ এবং ১২৮০০ সংখ্যাগুলির অনুপাত। এগুলির মধ্যে ১৬ সংখ্যাটি দ্বারা সূচিত ওজনটি ছিল প্রধান বড় একক। পরিমাপের এই প্রণালীটি কি সমগ্রভাবে গণিতজ্ঞানের প্রোজ্জ্বল প্রকাশ নয়?

উল্লিখিত প্রণালীতে বড় এককের সূচক হিসাবে ১৬ সংখ্যাটির নির্বাচন প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্যণীয় এবং অভিনিবেশ যোগ্য। বর্তমানকালের সের-ছটাক, কাঠা-ছটাক এবং টাকা-আনা সম্পর্কের পটভূমিকায় এ-নির্বাচনের কোন তাৎপর্য আছে কি? পিগট লিখেছেন: "This use of the multiple 16 is interesting and curious, and the number had a traditional importance in early Indian numerology, surviving indeed in the modern coinage of 16 annas to 1 rupee!"—অর্থাৎ, "১৬ সংখ্যাটির এই আনুপাতিক ব্যবহার চিত্তাকর্ষক এবং কৌতূহলোদ্দীপক। সংখ্যাটির প্রাচীন ভারতীয় সংখ্যায়নের ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত প্রাধান্য ছিল; আধুনিক

মুদ্রা-ব্যবস্থাতেও তার স্বাক্ষর রয়েছে—১৬ আনায় ১ টাকার মধ্যে !"

ওজন-প্রসঙ্গে, সে-যুগের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের লিখিত পাটীগণিতের জ্ঞান ছিল কিনা সে-সম্বন্ধে, পিগটের আর একটি সুচিন্তিত মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। বহু ব্যবহৃত ছোট ছোট বাটখারা সম্বন্ধে ইনি বলেছেন : "It has been suggested that as they are never marked with any sign to represent the weight, they may have been used among a merchant population largely ignorant of the art of writing or written arithmetic, but this seems a little unlikely. The way in which this weight system was preserved or enforced throughout the whole area of Harappa settlement and from beginning to end of the known duration of the culture is remarkable"—অর্থাৎ, "ওজনের পরিমাপ বোধক কোন চিহ্ন কোথাও না থাকাতে, এমন সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা হয়েছে যে ওজনগুলি প্রধানতঃ নিরক্ষর, লিখিত পাটীগণিত-জ্ঞানহীন ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হ'ত ; কিন্তু সে-সম্ভাবনা বোধ হয় খুব ক্ষীণ। এই ওজন-পদ্ধতি যেভাবে হরপ্পার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমগ্র এলাকায় সমগ্র সিন্ধু-সভ্যতার কালব্যাপী প্রচলিত বা বলবৎ ছিল তা সত্যিই বিস্ময়জনক।"

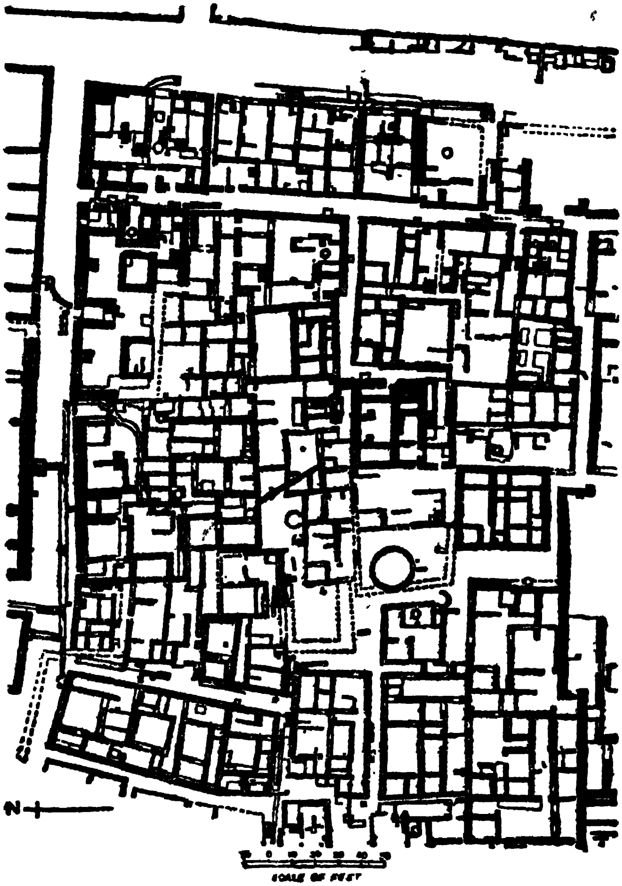
মহেঞ্জোদড়োয় একটি নলাকৃতি বা cylindrical পাত্র ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গেছে ; পাত্রটির গায়ে একটি মাপনী বা

scale খোদাই করা। মাপনীটিতে নিখুঁতভাবে সমদূরত্বে স্থাপিত অনেকগুলি দাগ আছে। হরপ্পাতেও একটি মাপনী আবিষ্কৃত হয়েছে—এটি একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত দণ্ড। গবেষকরা প্রাপ্ত মাপনী হু'টির সাহায্যে পুরাকীর্তিগুলির অন্যূন ১৫০টি পরিমাপ নিয়েছেন আর সিদ্ধান্ত করেছেন যে সিন্ধু-সভ্যতায় দৈর্ঘ্য-মাপের একই সঙ্গে অন্ততঃ হু'টি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পিগট, ম্যাকে প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত ভারত-পুরাতত্ত্ববিদ্গণ এমন মত-প্রকাশও করেছেন যে, মাপজোখের ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হ'ত।

'প্রিহিস্টরিক ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গের আলোচনার উপসংহারে পিগট লিখেছেন: "Behind these accurately constructed scales, and of course behind the whole lay-out of the Harppā street systems and house-plans, must lie a sound knowledge of practical geometry and land surveying."—অর্থাৎ, "এই সূক্ষ্মভাবে নির্মিত মাপনীগুলির পিছনে আর, শুধু মাপনী কেন, হরপ্পার সমগ্র নগর-পরিকল্পনার পিছনেই, ব্যবহারিক জ্যামিতি বিদ্যার ও জরীপ বিদ্যার সুগভীর এক জ্ঞান বর্তমান ছিল।"

বিশুদ্ধ গাণিতিক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া সম্ভব কেবল মাত্র গাণিতিক রচনা থেকে যার পূর্ব শর্ত হ'ল লিপি আবিষ্কার। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় অবশ্য এক ধরনের লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল—লিপি-উৎকীর্ণ বেশ কিছু শীলমোহর,

মৃৎপাত্র, তাম্রফলক প্রভৃতি সেখানে পাওয়া গেছে। আর, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যে-স্তরে সে-যুগের ভারতীয়েরা উন্নীত হয়েছিলেন তাতে লিপি ও কিছুটা পাটীগণিত আয়ত্ব করা তো,



মহেঞ্জোদড়ো নগরীর একাংশের নক্সা

প্রায় অবশ্যম্ভাবী। স্টুয়ার্ট পিগটের ভাষায়: "From merchants and trade to writing and arithmetic is a reasonable enough transition: Speiser has put the whole relationship into a delightfully cynical phrase—'writing was not a deliberate invention, but the incidental by-product of a strong sense of private property'."—অর্থাৎ, "ব্যবসায়ী ও ব্যবসা থেকে লিপি ও পাটীগণিতে উত্তরণ খুবই স্বাভাবিক: স্পাইসার সম্পর্কটা শ্রুতিকটু হলেও সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন—'লিপি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আবিষ্ক্রিয়া নয়, ব্যক্তিগত মালিকানা-বোধের আনুষঙ্গিক ফল'।" কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এখনও পর্যন্ত পণ্ডিতরা সে-লিপির পাঠোদ্ধার বা মর্মোদ্ঘাটন করতে পারেননি। অক্লান্ত ও সযত্ন প্রচেষ্টায় গবেষকরা এ-পর্যন্ত যে-গোটাকয়েক সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পেরেছেন তার মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত এই যে—লিপিটি বেশ উন্নত পর্যায়ের; কারণ, প্রাচীন সুমের প্রভৃতি দেশের লিপিতে যেখানে মোট বিভিন্ন প্রতীকের সংখ্যা ৯০০, ২০০০ প্রভৃতির মত বিরাট বিরাট সংখ্যা, সেখানে হরপ্পা-লিপিতে মোট প্রতীকের সংখ্যা মাত্র ৪০০, বা সামান্য হেরফের উপেক্ষা করলে, ২৫০ এর মত। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুসারে, লিপিটিতে খুব সম্ভব সংখ্যাবোধক কতকগুলি প্রতীক আছে।

বৈদিক যুগ

পভূমিকা ঃ গণিতজ্ঞান ঃ গণিতবিদ ও গণিতগ্রন্থ

॥ পটভূমিকা ॥

বৈদিক সভ্যতা অর্থাৎ বৈদিক যুগের ভারতীয় সভ্যতা বলতে যাকে বোঝায় তা মুখ্যতঃ ও মূলতঃ আর্যসভ্যতা। কিন্তু সম্ভবতঃ অনার্য সভ্যতার স্বাক্ষর বা প্রভাবও সেক্ষেত্রে কিছু কিছু বর্তমান।

নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হ'লেও, এ-কথা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত যে আর্যরা ভারতবর্ষে বহিরাগত। সঠিকভাবে বলা যায় না কিন্তু সম্ভবতঃ খৃষ্টজন্মের ২০০০ বা ২৫০০ বছর আগে আর্যরা তাঁদের কোন এক পূর্ব বাসভূমি থেকে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন; অতঃপর দীর্ঘকাল ধরে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে অবশেষে ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁরা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্য সাহিত্যে পূর্বতন বাসভূমি বা পিতৃভূমির কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই, কিন্তু অনার্য তথা 'রাক্ষস', 'দানব', 'দস্যু', 'দাস' প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রামের কথা আছে। ঋগ্বেদের একস্থানে যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে 'হরিযূপীয়া'-র উল্লেখ আছে—কোন জনপদ বা মতান্তরে নদীর নাম হিসাবে। উল্লিখিত হরিযূপীয়া অধুনা পরিচিত হরপ্পার সম্পর্কিত বলে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন; বিশ্বাস করেন

যে হরিযূপীয়া তথা হরপ্পাতে লৌহাস্ত্র-সজ্জিত, অশ্বারূঢ় আর্য যোদ্ধারা সিন্ধু-সভ্যতার প্রতিনিধিদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন আর লৌহ ও অশ্বের ব্যবহার-অনভিজ্ঞ সিন্ধু-সভ্যতাকে আর্য শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

ভারতবর্ষে আর্যদের আদি বসতি উত্তর-পাশ্চমাঞ্চলে। এই অঞ্চল বৈদিক যুগে সপ্তসিন্ধু নামে অভিহিত হ'ত। সেখানকার সিন্ধু, বিতস্তা, বিপাশা, শতদ্রু প্রভৃতি কয়েকটি নদীর বর্তমানে প্রচলিত বা তদনুরূপ নাম বৈদিকসাহিত্যে পাওয়া যায়। সপ্তসিন্ধু থেকে ব্রহ্মাবর্ত বা বর্তমান পূর্ব পাঞ্জাব আর সেখান থেকে ক্রমশঃ আরো পূর্বে কুরু-পঞ্চাল অর্থাৎ বর্তমান দিল্লী-মীরাট এলাকা, কোশল ও কাশী অর্থাৎ বর্তমান উত্তর প্রদেশ, বিদেহ অর্থাৎ বর্তমান উত্তর বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যবসতির বিস্তার হ'তে থাকে। ভারতের পূর্বতম ও দক্ষিণ অঞ্চলে আর্য আধিপত্য বিস্তৃত হ'তে অনেক সময় লাগে। রামচন্দ্র ও অগস্ত্য ঋষির দক্ষিণাভিযানের সুপরিচিত কাহিনী সম্ভবতঃ কোন ঐতিহাসিক ঘটনার পৌরাণিক বিবরণ। বৈদিক যুগের শেষদিকে বর্তমান বেরারের কাছে বিদর্ভ, নাসিকের কাছে দণ্ডক এবং গোদাবরী-তীরে মূলক ও অশ্মক এই আর্য রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ও পূর্ব বিহারে এবং বাংলাদেশে বহুকাল পর্যন্ত কীকট, পুন্ড্র প্রভৃতি অনার্যদের আধিপত্য ছিল। সেখানে আর্যপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বৈদিক যুগের একেবারে শেষভাগে, বা মতান্তরে তারও পরবর্তী কালে।

বৈদিক যুগের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বা এমনকি তথাকথিত আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতেও সর্বত্র আর্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনার্য তথা 'দাস' জাতির কর্তৃত্বে কিছু রাজ্য যে ছিল বিভিন্ন সময়ে রচিত আর্য সাহিত্যে বারবার তার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর এই আর্য-অনার্য সহাবস্থান ও অপরিহার্য সংস্পর্শ স্বভাবতঃই দুই সভ্যতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে অবশেষে সমন্বিত করে। সম্ভাব্য দৃষ্টান্ত হিসাবে, আর্য জীবনচর্যায় অনার্য দেবতা পশুপতি বা শিব, অনার্য পদ্ধতি মূর্তিপূজা, পশুবলি প্রভৃতির অনুপ্রবেশের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

বৈদিক যুগের একেবারে গোড়ার দিকে ভারতভূমিতে আর্যরা সম্ভবতঃ পশুপালনের উপর নির্ভরশীল কতকটা ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করতেন; পরে ক্রমশঃ কৃষিকার্যে জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জন করে স্থায়ী বসবাস সুরু করেন। প্রথম দিকে মুদ্রার ব্যবহার ছিল না, ছিল বিনিময় ব্যবস্থা। গো-ধন ছিল সে-ব্যবস্থার স্তম্ভ স্বরূপ—গরুর সঙ্গে তুলনা করে দ্রব্যমূল্য স্থিরীকৃত হ'ত। পরে সম্ভবতঃ 'নিষ্ক' নামের স্বর্ণখণ্ড বিনিময় ও দ্রব্যমূল্য-নির্ণয়ের মাধ্যম হয়। খাদ্যদ্রব্য ছাড়া ক্রমোন্নতিশীল জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের তাগিদে বৈদিক ভারতে স্বভাবতঃই অনেক বৃত্তির উদ্ভব হয়—কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, চর্মকার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, স্থপতি, রথনির্মাতা প্রভৃতি শ্রমজীবীর অনেক উল্লেখ ও বিবরণ বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান।

বৈদিক আর্যদের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিতে দেবত্ব আরোপ

করে, তাদের তুষ্টিবিধানের জন্য বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বহু প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ত।

প্রতিষ্ঠিত বৈদিক জীবনে পরিবার-গঠিত গ্রাম ও গ্রাম-গঠিত 'বিশ' বা 'জন'-এর উপরে ছিলেন 'বিশপতি' বা 'রাজন্' বা রাজা। বৈদিকযুগের প্রথম দিকে সামাজিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে রাজার ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ—'সভা' ও 'সমিতি' নামে অভিহিত প্রজা-গঠিত দুই প্রকার সংস্থা থাকত, সেগুলির মতামত অনুসারেই শাসনকার্য সমাধা হ'ত। কিছু কিছু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ছিল—যেখানে 'গণপতি' বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হ'ত, উত্তরাধিকার-সূত্রে নির্ধারিত হ'ত না। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষদিক রাজশক্তির বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, এক রাজার অন্য রাজার উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টারও অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। 'অশ্বমেধ', 'রাজসূয়' প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান এবং 'একরাট', 'সম্রাট' প্রভৃতি উপাধি ধারণ হয় শেষ-বৈদিক যুগের রীতি।

বৈদিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় উৎকর্ষের পরিচয় পেতে হলে বৈদিক সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও হীনমন্য, অনুদার-প্রকৃতি কিছু ইউরোপীয় ইতিহাস-রচয়িতা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীনত্ব ও মহত্ত্বকে খর্ব করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তবুও এ কথা ঠিক যে, অনেকাংশে ইউরোপীয়, বিশেষ ক'রে জার্মান গবেষকদের চেষ্টার ফলেই ভারত-সভ্যতার এই অংশের উপর কিছু আলোকপাত হয়েছে। উদার ও

সত্যান্বেষী-দৃষ্টি-সম্পন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে য়্যাকবি (Jacobi), ভিন্‌তারনিৎস (Winternitz), ম্যাক্‌স্‌ম্যুলার (Max Müller), কোলব্রুক (Colebrooke), সিল্‌ভঁা-লেভি (Sylvan-Levi), প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। ইতিহাসের এই অংশ নিয়ে মুল্যবান গবেষণা করেছেন এমন ভারতীয়দের মধ্যে আছেন রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলক, ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, বাপুদেব শাস্ত্রী, সুধাকর দ্বিবেদী, বিভূতি ভূষণ দত্ত প্রভৃতি।

ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'বেদ'। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদের প্রধান প্রধান অংশগুলির রচনার কৃতিত্ব সম্ভবতঃ বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকজন লোকোত্তর মনীষাসম্পন্ন ঋষির। উল্লিখিত ঋষিদের অবশ্য প্রাচীন সাহিত্যে বেদস্রষ্টা না বলে 'মন্ত্রদ্রষ্টা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা অলোকসাধারণ ধ্যান, জ্ঞান, অনুভূতির শক্তিতে বেদের মন্ত্রকে উপলব্ধি বা শ্রবণ করেছেন; বেদের অপর এক নাম তাই দেওয়া হয়েছ 'শ্রুতি'। আদিতে বেদ ছিল এক ও অবিভক্ত। বেদব্যাস নামে খ্যাত ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ পরে বেদকে চারটি খণ্ডে বিভাগ করেন, যথা—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। সম্ভবতঃ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেও এটাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। প্রত্যেক বেদ 'সংহিতা' এবং 'ব্রাহ্মণ' এই দুই অংশে বিভক্ত। সংহিতাংশ পদ্যে লিখিত। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মহিমাকীর্তন এই অংশের

প্রধান উপজীব্য। ব্রাহ্মণভাগ প্রধানতঃ গদ্যে রচিত। ইহা বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের বিধিনির্দেশক। 'আরণ্যক' এবং 'উপনিষদ' বা 'বেদান্ত' নামে বেদের আরও দুটি অংশ আছে; তবে এগুলিকে ব্রাহ্মণাংশেরই পরিশিষ্টরূপে গণ্য করা চলে। বেদ রচিত হবার পর ব্যাকরণ, নিরুক্ত, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। এগুলিকে সাধারণভাবে 'বেদাঙ্গ' নামে অভিহিত করা হয়। ব্যাকরণ ও নিরুক্ত অর্থাৎ অভিধান রচনায় যথাক্রমে পানিনি ও যাস্ক এই দুই মহামনীষীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আবার কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসা ও ব্যাসের উত্তর মীমাংসা এই ষড়্দর্শন ও ছয় বেদাঙ্গ একত্রে 'সূত্র' সাহিত্য নামে পরিচিত। সূত্র সাহিত্যের অন্তর্গত কল্পসূত্র শ্রৌত, গৃহ্য, শুল্ব প্রভৃতি কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এগুলির মধ্যে শুল্বসূত্র গণিতজ্ঞানের আলোয় সমুজ্জ্বল।

বৈদিক যুগের প্রাচীনত্ব এবং সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতির রচনাকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য আছে। ফলে, খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময়কে বৈদিক সাহিত্য রচনার প্রারম্ভকাল হিসাবে উল্লিখিত হ'তে দেখা যায়। বৈদিক ভারত সম্পর্কে যে-কোন পর্যালোচনার ঐতিহাসিক পটভূমিকা গঠন করতে হ'লে এ-বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। মতভেদের দৃষ্টান্ত হিসাবে, ভারতীয় গবেষক বালগঙ্গাধর তিলক

এবং জার্মান গবেষক ম্যাক্স্‌মূ্যলার ও য়্যাকবির পরস্পরবিরোধী মতের উল্লেখ করা যেতে পারে। ম্যাক্স্‌মূ্যলারের বিবেচনায় বেদ রচিত হয় খৃষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ১২০০ বৎসরের মধ্যে। য়্যাকবি ও তিলক আকাশে গ্রহনক্ষত্রের বর্তমান অবস্থান ও বেদে বর্ণিত অবস্থানের তুলনা করেছেন এবং অয়নচলন বা precession of the equinoxes-এর ব্যবহার করেছেন। য়্যাকবির হিসাবে খৃষ্টপূর্ব ২৭৮০ অব্দের সমসাময়িক কালে বৈদিক সাহিত্যের প্রারম্ভ; তিলকের গণনাফল কিছুটা অনির্দিষ্ট—খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ থেকে ২৫০০ সনের মধ্যে।

কালনির্ণয়ের প্রশ্নটি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মজুমদার ও পুসালকার-এর সম্পাদনায় কয়েক বছর আগে প্রকাশিত 'দি হিস্ট্রী এ্যাণ্ড কালচার অফ্‌ দি ইণ্ডিয়ান পিপল্‌' গ্রন্থের 'দি ভেদিক্‌ এজ' খণ্ডে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে। সে-বিচার অনুসারে, ঋগ্বেদ রচনা শেষ হয় খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের সমসাময়িক কালে; রচনার সূত্রপাত হয়তো আরো প্রায় ৫০০ বৎসর আগে। বৈদিক সভ্যতা অবশ্য অধিকতর প্রাচীন কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের চেয়ে প্রাচীনতর নয়। অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি রচিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৮০০ অব্দের মধ্যে। উপনিষদের প্রাচীনতম অংশগুলি নিঃসন্দেহে বুদ্ধপূর্ব যুগের অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫৬৭ অব্দের পূর্ববর্তী।

প্রাচীন ভারতীয় গণিত আলোচনার পক্ষে 'বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ' নামক গ্রন্থ এবং শুল্বসূত্রগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের সমসাময়িক কাল। আর প্রধান প্রধান শুল্বসূত্রগুলি অর্থাৎ বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতির শুল্বগুলি রচিত হয় খৃষ্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৪০০ সনের মধ্যে।

ভারত-ইতিহাসে বৈদিক যুগের সীমা হিসাবে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের অনুরূপ কালকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ঐ সময়ে কতকগুলি বেদবিরোধী ধর্মমতের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী অনেক শতাব্দী ধরে সেগুলির ভারতবর্ষে বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

॥ গণিতজ্ঞান ॥

প্রাক্‌বৈদিক যুগে মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সুপ্রাচীন ভারতীয়েরা জীবনের সহজ ও সাধারণ প্রয়োজনের দাবীতে পাটীগণিত-জ্যামিতি-জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক প্রকার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকে এ-সিদ্ধান্ত করা যায়। কিন্তু প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে স্বাধীন, বলিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা ও তৎপ্রসূত জ্ঞানের প্রথম বিকাশ দেখা যায় বৈদিক ভারতে। বৈদিক যুগেই ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গম হয়, আত্মপ্রকাশ করে গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা। বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে এই সময়ের অন্যান্য সভ্য জাতির

তৎপরতার তুলনায় ভারতীয় তৎপরতা সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য, অনেকগুলি বিষয়ে ভারতীয় অগ্রগামিতা রীতিমত বিস্ময়কর।

বৈদিক ভারতে বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে গণিতের এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসন ছিল। সমকালীন সাহিত্যে তার অনেক প্রমাণ আছে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের এক স্থানে আছে:

"যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্ধনি স্থিতম্॥"

—অর্থাৎ, "ময়ূরের শিখার মত, সাপের মণির মত বেদাঙ্গশাস্ত্র গুলির শীর্ষদেশে গণিতের অবস্থিতি।" ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত একটি কাহিনীতে ঋষি সনৎকুমারের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষাভিলাষী নারদ নিজের বিশেষ যোগ্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'নক্ষত্রবিদ্যা' অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা ও 'রাশিবিদ্যা' অর্থাৎ পাটীগণিতে তাঁর পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করেন। মুণ্ডকোপনিষদেও 'পরাবিদ্যা' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার সহায়ক হিসাবে গণিতাদি 'অপরাবিদ্যা'র কথা আছে।

বৈদিক সাহিত্যের অব্যবহিত পরবর্তী বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও গণিতজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া আছে। জৈন ধর্মগ্রন্থ চারটি 'অনুযোগ' বা অংশে বিভক্ত। এর একটি অনুযোগের নাম 'গণিতানুযোগ'। 'ভগবতী সূত্র' ও 'উত্তরাধ্যয়ন-সূত্র'-এ সংখ্যাজ্ঞানকে জৈন-পুরোহিতের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধগ্রন্থ 'বিনয়-পিটক', 'মজ্ঝিম নিকায়' ও 'চুল্লনিদ্দেস'-এ গণিতকে সকল কলার মধ্যে প্রথম ও প্রধান বলা হয়েছে।

তখনকার ভারতবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার জন্য ৫ থেকে ১২ বৎসর কাল নির্দিষ্ট করা হ'ত। এই সময়ে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল—লিপিশিক্ষা, রূপশিক্ষা আর গণিতশিক্ষা। রূপশিক্ষা বলতে বোঝাত অঙ্কন ও জ্যামিতি শিক্ষা। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ গণিত একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় রূপে বর্ণিত আছে। এ-গ্রন্থটি অবশ্য বৈদিক যুগের কিছু পরবর্তী কালের।

বিরাট বিরাট সংখ্যাসমূহের কল্পনা ও নামকরণ বৈদিক যুগের ভারতীয়দের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। একমাত্র মিশরীয় ছাড়া আর কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে এর তুলনা পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ রোমান গণিতে mille বা ১০০০ ও গ্রীক গণিতে myriad বা ১০,০০০-এর ঊর্ধ্বে কোন সংখ্যার নাম পাওয়া যায় না; অপর পক্ষে, বাজসনেয়ী সংহিতায় ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় অযুত বা ১০,০০০-এর ঊর্ধ্বে নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যর্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত ও পরার্ধ এই উত্তরোত্তর দশগুণ ৮টি সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। মৈত্রায়ণী সংহিতা, কাঠক সংহিতা, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এবং সাংখ্যায়ন শ্রৌত সূত্রেও অনুরূপভাবে ক্রমবর্ধমান কতকগুলি সংখ্যার শ্রেণী লিপিবদ্ধ করা আছে; সেখানে অবশ্য অন্য সংখ্যা-বোধক নাম ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, সাংখ্যায়ন শ্রৌত সূত্রে ন্যর্বুদের পর আরও ৫টি সংখ্যা আছে; সেগুলির নাম যথাক্রমে নিখর্ব, সমুদ্র, সলিল, অন্ত্য ও অনন্ত। শেষোক্ত সংখ্যাটিকে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতে হ'লে ১-এর

পর ১৩টি শূন্য বসাতে হ'বে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৈদিক যুগের অল্প পরবর্তী সাহিত্যে আরো অনেক বড় বড় সংখ্যার কথা আছে ; 'তল্লক্ষণ' ও 'শীর্ষ-প্রহেলিকা'-কে প্রকাশ করতে হ'লে যথাক্রমে ৫৪টি ও ১৯৪টি অঙ্ক-স্থান বা notational place-এর প্রয়োজন হয়।

সুদূর অতীতে, সংখ্যা সম্বন্ধে যাঁরা এতদূর অগ্রসর ছিলেন, তাঁরা খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য গাণিতিক তৎপরতার ক্ষেত্রেও ছিলেন বিশেষ ভাবে উন্নত। ভারতবর্ষে তখন গণিত শাস্ত্রের বর্তমান শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান—এই ৪টি বিষয়ের চর্চা ছিল। জ্যামিতির প্রচলিত রূপের নাম ছিল 'শুল্ব-সূত্র' বা 'শুল্ব'— এটিকে বেদাঙ্গ-শাস্ত্রগুলির অন্যতম 'কল্প-সূত্র'-র অংশ হিসাবে গণ্য করা হ'ত।

বৈদিক যুগের পাটীগণিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গকরা ও বর্গমূল নির্ণয় করা—এই প্রক্রিয়াগুলির আলোচনা আছে। নিখুঁত বর্গ বা perfect square নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয়ে—অর্থাৎ, বর্গমূলের স্থূলমান বা approximate value নির্ণয়ে—বৈদিক হিন্দুরা বিশেষ দক্ষ ছিলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, প্রাচীন হিন্দু গণনানুসারে—

$$\sqrt{২} = ১ + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৩.৪} - \frac{১}{৩.৪.৩৪} ;$$

দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে এর মান দাঁড়ায় ১.৪১৪২১৫৬ ; আর, বর্তমান উন্নত হিসাব অনুসারে $\sqrt{২}$ = ১.৪১৪২১৩৫··· । $\sqrt{৩}$, $\sqrt{৫}$, $\sqrt{২৯}$, $\sqrt{৬১}$ প্রভৃতি আরো অনেক অমেয় বা

incommensurable সংখ্যার স্থূলমান শুল্বসূত্রের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত আছে।

কিন্তু হিন্দুরা কি সে-যুগে এই সংখ্যাগুলির অমেয়ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন? পণ্ডিতদের মধ্যে এ-সম্পর্কে দ্বিমত আছে। থিবট্ (Thibaut), ফন্ শ্রোডার (Von Schröder), ব্যুর্ক (Bürk), গার্বে (Garbe), হপকিন্‌স্ (Hopkins) ম্যাক্‌ডোনেল্ (Macdonell) প্রমুখ গবেষকেরা ভারতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। $\sqrt{২}$-এর মান নিঃশেষে নির্ণয় করার হিন্দু প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে থিবট্ বলেছেন : "...undoubtedly they arrived soon at the conclusion that they would never find exactly what they wanted and had to be contented with an approximation"—অর্থাৎ, "তাঁরা নিঃসন্দেহে অত্যল্পকালের মধ্যেই বুঝেছিলেন যে তাঁদের অভীষ্ট ফল কিছুতেই পুরোপুরি পাওয়া যাবে না আর বাধ্য হ'য়ে নিকটবর্তী ফলেই তাঁদের সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল।" অপরদিকে ৎসেন্‌থেন (Zenthen), ক্যান্টর (Cantor), ফোগ্‌ট্ (Vogt) ও হীথ্ (Heath) এ-সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছেন। সে যাই হোক, বৈদিক ভারতবর্ষ যে বর্গমূল নির্ণয়ে ও অমূলদ বা irrational রাশির ব্যবহারে সমকালীন অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় খুবই অগ্রগামী ছিল, এ-কথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংস্কৃত 'মূল' শব্দটির অনুবাদ করেই ইউরোপে ল্যাটিন 'radix' ও ইংরেজী 'root' শব্দের ব্যবহার সুরু হয়।

অমূলদ সংখ্যার মত সামান্য ভগ্নাংশ বা **vulgar fraction**-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বৈদিক হিন্দুরা বিস্ময়কর অগ্রগামিতার পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি ঋগ্বেদেও ছোট ছোট ভগ্নাংশের ব্যবহার আছে। তৎকালীন সাহিত্যে ভগ্নাংশ অর্থে সাধারণতঃ 'অংশ' ও 'ভাগ'—এই শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হ'ত। সাধারণভাবে যে কোন ভগ্নাংশ এবং বিশেষ করে এক-ষোড়শাংশ বোঝাতে 'কলা' শব্দটিও ব্যবহার ছিল। ভগ্নাংশের কিছু কিছু ব্যবহার প্রাচীন মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় ও চৈনিক গাণিতিকদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু এঁরা কেবলমাত্র ১-এর অংশবাচক ভগ্নাংশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পক্ষান্তরে, ভারতীয়েরা ত্রি-অষ্টম অর্থাৎ ৩/৮, দ্বি-সপ্তম অর্থাৎ ২/৭ প্রভৃতি রাশিও ব্যবহার করতেন। ভগ্নাংশদের মধ্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা, ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ গ্রহণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার অনেক দৃষ্টান্ত বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ শুল্ব-সূত্রের বিভিন্ন স্থানে, ছড়ান আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে কাল-বিভাগের একটি ধারা আছে যার পরিকল্পনা ও ব্যবহার উন্নত ভগ্নাংশ-জ্ঞান সাপেক্ষ। ধারাটি এই :

১ দিনে	৩০ মুহূর্ত,
১ মুহূর্তে	১৫ ক্ষিপ্র,
১ ক্ষিপ্রে	১৫ ইতর্হি,
১ ইতর্হিতে	১৫ ইদানী.
১ ইদানীতে	১৫ প্রাণ।

(প্রাণ আধুনিক কালের প্রায় ১/৮ সেকেণ্ড।)

বৌধায়ন-শুল্বে বর্ণিত ৩টি হিসাবকে আধুনিক অঙ্ক-পাতন পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে পাওয়া যায় :

$$৭\frac{১}{২} \div \frac{১}{২৫} = ১৮৭\frac{১}{২},$$

$$\left(২\frac{২}{৩}\right)^২ + \left(\frac{১}{২} + \frac{১}{১২}\right)\left(১ - \frac{১}{৩}\right) = ৭\frac{১}{২},$$

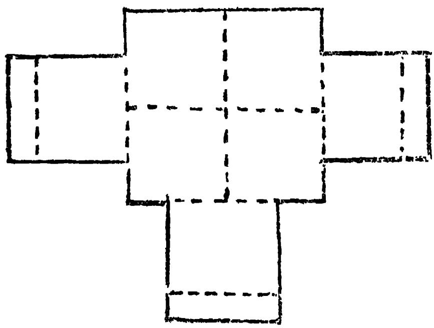
এবং $৭\frac{১}{২} \div \frac{১}{২}$এর$\frac{১}{১৫} = ২২৫$ ।

অনুরূপভাবে, আপস্তম্ব-শুল্বের ২টি উক্তির অর্থ হয় :

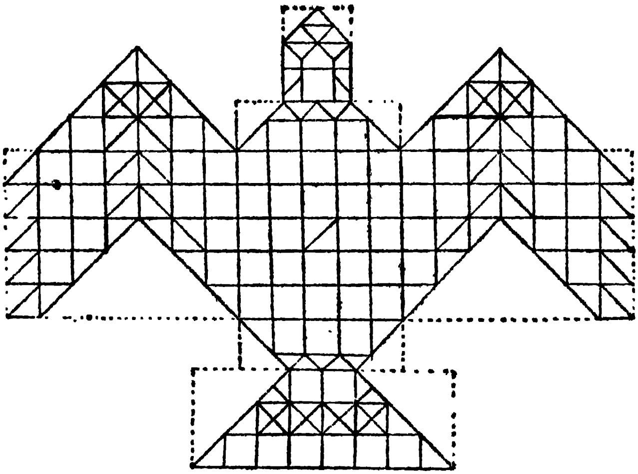
$$\left(১\frac{১}{২}\right)^২ = ২\frac{১}{৪} \text{ এবং } \left(২\frac{১}{২}\right)^২ = ৬\frac{১}{৪} ।$$

বৈদিক হিন্দুরা কি দশমিক ভগ্নাংশ বা dccimal fraction-এর ব্যবহারও জানতেন ? ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পতঞ্জলির রচনা থেকে একটি সূত্র উদ্ধৃত করে এই মতকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই এ-সম্পর্কে সংশয় বা ভিন্ন মত পোষণ করেন।

যজ্ঞানুষ্ঠান বৈদিক হিন্দুর ক্রিয়াকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল, আর যজ্ঞানুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল বেদী-নির্মাণ। প্রাচীন ভারতে জ্যামিতির বিকাশের পিছনে বেদী-



‘শ্যেন-চিৎ’ : শুল্বসূত্রে বহু আলোচিত, যাগযজ্ঞে বহু ব্যবহৃত বাজপাখীর আকৃতি-বিশিষ্ট একটি বেদী



'বক্র-পক্ষ ব্যস্ত-পুচ্ছ শ্যেনচিৎ' : শুল্বকারদের বিশেষ প্রিয় একটি বেদী

নির্মাণের প্রচুর অবদান আছে। এ-ব্যাপারে গৃহ-নির্মাণ, নগর-পরিকল্পনা ও সেচসংক্রান্ত পূর্ত-কার্যের সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্য সহজেই অনুমেয়। সমসাময়িক কালের চীন ও মিশর দেশের জ্যামিতির তুলনায় ভারতীয় জ্যামিতি অনেক বিষয়ে অধিকতর উন্নত ছিল। আর, গ্রীক জ্যামিতির চেয়ে উন্নততর না হ'লেও ভারতীয় জ্যামিতি সম্ভবতঃ প্রাচীনতর। জ্যামিতি-বিদ্যার প্রথম সূত্রপাত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মত প্রকাশ করেছেন: "It should never be forgotten that the world owes its first lessons in geometry, not to Greece, but to India."—অর্থাৎ, "জ্যামিতির পাঠ পৃথিবী সর্বপ্রথম ভারতের কাছ

থেকেই নিয়েছে, গ্রীসের কাছ থেকে নয়—এ-কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।"

বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রমুখ শুল্বকারগণ নির্দিষ্ট সমতল- ও ঘন-ক্ষেত্র রচনায় এবং ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নির্ণয়ে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোন এক ক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল-বিশিষ্ট অপর এক ক্ষেত্র রচনার ব্যাপারেও তাঁরা অনেক মূল্যবান আবিষ্কার করেন। তাঁদের দ্বারা বিবেচিত কতকগুলি জ্যামিতিক প্রশ্নের দৃষ্টান্ত :

প্রশ্ন	শুল্বকার
কোন এক সরল রেখার ভিতরের বা বাইরের কোন এক বিন্দু থেকে সরলরেখার উপর লম্ব টানা	কাত্যায়ন
নির্দিষ্ট মাপের আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্র রচনা করা	বৌধায়ন, আপস্তম্ব
নির্দিষ্ট ভূমি ও উচ্চতার সমদ্বিবাহু ট্র্যাপিজিয়াম রচনা করা	বৌধায়ন, আপস্তম্ব
নির্দিষ্ট বাহু ও কোণের সামান্তরিক রচনা করা	আপস্তম্ব
নির্দিষ্ট বর্গক্ষেত্রের n-গুণ বা n-ভাগ ক্ষেত্রফল-বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র রচনা করা, যেখানে n যে-কোন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা	বৌধায়ন, আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন

দুই বর্গক্ষেত্রের যোগফল বা বিয়োগ ফলের সঙ্গে সমান এমন বর্গক্ষেত্র রচনা করা	বৌধায়ন, আপস্তম্ব, ও কাত্যায়ন
দুই ত্রিভুজের যোগফলের সঙ্গে সমান এমন বর্গক্ষেত্র রচনা করা	কাত্যায়ন
আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রকে পরস্পরে রূপান্তরিত করা	বৌধায়ন, কাত্যায়ন
বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রকে ত্রিভুজ, রম্বাস বা সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ামে রূপান্তরিত করা	বৌধায়ন, আপস্তম্ব, ও কাত্যায়ন
রম্বাসকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা	কাত্যায়ন
বৃত্ত ও বর্গক্ষেত্রকে পরস্পরে রূপান্তরিত করা	বৌধায়ন, আপস্তম্ব, ও কাত্যায়ন

এখনকার গণিত-সাহিত্যে সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত যে-উপপাদ্যটি 'পিথাগোরাসের উপপাদ্য' নামে প্রচলিত, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক বিশিষ্ট চিন্তাবীরের মতে, তার সত্য সম্ভবতঃ প্রথমে ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যুর্ক, হাংকেল (Hankel) ও শ্যোপেনহাউয়ার (Schopenhauer)-এর নাম করা যেতে পারে। গ্রীক-গণিতের ভক্ত ঐতিহাসিক হীথ্-ও, পিথাগোরাসের দাবী প্রসঙ্গে স্বীকার করেন

যে, "....no really trust-worthy evidence exists that it was actually discovered by him."—অর্থাৎ, "এটা যেসত্যিই তাঁর আবিষ্কার তার প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ নেই।" লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভারত-গণিত-ঐতিহাসিক ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্ত তাঁর 'দি সায়ান্স অফ দি শুল্ব' (The Science of the Sulba) গ্রন্থে প্রশ্নটিকে বিশদভাবে বিচার করেছেন। তাঁর মতে আলোচ্য উপপাদ্যটি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হওয়ার সমাধিক সম্ভাবনা এবং এ-জ্ঞান সম্ভবতঃ শুল্বকারগণ লাভ করেন 'পৈতৃকী বেদী'র মাধ্যমে।

গ্রীক জ্যামিতিকারদের তুলনায় ভারতীয়দের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটীর কথা এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা উচিত। প্রথমতঃ গ্রীক জ্যামিতিতে প্রতিজ্ঞা বা proposition গুলিকে যুক্তির সাহায্যে নিশ্ছিদ্র ভাবে প্রমাণের যেমন চেষ্টা দেখা যায়, ভারতীয় শুল্বসূত্রে তেমন নয়। তার কারণ অবশ্য সহজেই বোধগম্য—জ্যামিতি বিজ্ঞানের সৃষ্টি বা উন্নতি শুল্বকারদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল না। ফলে শুল্বসূত্রে যে-পরিমাণে জ্যামিতিক সত্য উপলব্ধির স্বাক্ষর আছে সে-পরিমাণে যুক্তি-প্রমাণজ্ঞানের স্বাক্ষর নেই। কোথাও কোথাও অবশ্যই প্রমাণের চেষ্টা আছে এবং প্রমাণ-সিদ্ধির দাবী আছে—Q.E.D. বা Q.E.F.-এর অনুরূপ, 'সা সমাধিঃ'। কিন্তু এই প্রমাণের ক্ষেত্রেও প্রমাণসাপেক্ষ অনেক প্রতিজ্ঞাকে শুল্বসূত্রে বিনা প্রমাণে ব্যবহার করা হয়েছে, যথা—আয়তক্ষেত্র কর্ণদ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত হয়, একই ভূমি- ও উচ্চতা-সম্পন্ন দুই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল

সমান ইত্যাদি। শুল্বসূত্রের দ্বিতীয় ত্রুটী অতি সংক্ষিপ্ততা ও দ্ব্যর্থকতা। অনেক জায়গায় শুল্বকারদের বক্তব্য বা ধ্যানধারণা তাঁদের রচনায় সুস্পষ্ট নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বৃত্ত ও বর্গক্ষেত্রকে পরস্পরে রূপান্তরিত করার প্রশ্নটি বিবেচনা করা যেতে পারে। ইতিপূর্বেই প্রশ্নটির উল্লেখ করা হয়েছে—বৌধায়ন, আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন সকলেই নিজ নিজ শুল্বে সমস্যাটির বিশুদ্ধ জ্যামিতিক সমাধান নির্দেশ করেছেন। তাঁদের সমাধান স্থূল বা approximate—সঠিক বা exact নয়। এ-ঘটনা অবশ্য বৈদিক হিন্দু জ্যামিতির কোন দুর্বলতার পরিচায়ক নয়; আসলে সমস্যাটির বিশুদ্ধ জ্যামিতিক সমাধান আদৌ সম্ভব নয়, এ-কথা গত শতাব্দীর শেষ দিকে প্রমাণিত হয়েছে। তার আগে প্রায় ২ হাজার বৎসর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা হয়েছে আর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে—স্থূল সমাধান পাওয়া গেছে, সঠিক সমাধান নয়। কিন্তু অসাফল্যই তো আর অসম্ভব্যতার প্রমাণ নয়, অতএব প্রচেষ্টায় বিরতি হয়নি। অবশেষে ১৮৮২ সালে জার্মান পণ্ডিত লিণ্ডেমান (Lindemann) তত্ত্বগত ভাবে প্রমাণ করেছেন যে সমস্যাটির বিশুদ্ধ জ্যামিতিক সমাধান অসম্ভব। অসম্ভাব্যতার কারণ 'পাই' (π) সংখ্যাটির অমেয়ত্ব—বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত সূচক এই ধ্রুব বা constant সংখ্যাটির মান প্রায় $\frac{২২}{৭}$ কিন্তু সঠিক মান অনির্ণেয়। প্রশ্ন ওঠে বৈদিক হিন্দুরা কি সেকথা অনুমান করেছিলেন? আপস্তম্ব বর্গক্ষেত্রকে বৃত্তে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি নির্দেশ করে লিখেছেন "সানিত্যা

মণ্ডলম্ ঃ যাবদ্ধীয়তে তাবদাগন্তু”। এ-উক্তির শেষাংশের অর্থ কি ? ওখানে কি সঠিক সমাধানের অসম্ভাব্যতার ইঙ্গিত রয়েছে ? আর অতদূর জ্ঞান যদি না-ও আয়ত্ব হয়ে থাকে, অন্ততঃপক্ষে তাঁর সমাধান যে স্থূল সেকথা আপস্তম্ব বুঝেছিলেন কি ? না অজ্ঞানতাবশতঃ লব্ধ সমাধানকে সঠিক মনে করেছিলেন ? থিবট্ ও ব্যুর্ক মনে করেন : সানিত্যা = সা নিত্যা। অন্য পণ্ডিত আছেন যাঁদের বিবেচনায় : সানিত্যা = সা অনিত্যা। এ-প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য যে, শুল্বকারগণ সঠিক বোঝাতে ‘নিত্য’ এবং স্থূল বোঝাতে ‘অনিত্য’ কথার ব্যবহার করতেন, আর ‘মণ্ডল’ কথাটি ব্যবহার করতেন বৃত্তের সমার্থক হিসাবে। অতএব ? অতএব আলোচ্য বিষয়ে আপস্তম্বর সঠিক জ্ঞানের কথা তাঁর সমসাময়িকদের জানা ছিল, আজকের গণিত-ঐতিহাসিকের বোধহয় সন্দেহাতীত ভাবে তা জানার কোন উপায় নেই।

গণিতশাস্ত্রের প্রধান প্রধান শাখাগুলির মধ্যে যেটিতে, সামগ্রিক বিচারে, প্রাচীন ভারতের কৃতিত্ব সর্বাধিক স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেয়েছে তা বীজগণিত। এ-বিষয়ে প্রাচীন ভারতের দূর শ্রেষ্ঠত্ব একরূপ সর্বজনস্বীকৃত। বীজগণিতের ক্ষেত্রে ভারতীয় গণিত-প্রতিভার গৌরবোজ্জ্বল প্রস্ফুটনের সুরু হয় বেদোত্তর যুগে—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে, মহাপণ্ডিত আর্যভটের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু তার বীজ উপ্ত হয়েছে বৈদিক যুগেই।

বৈদিক যুগে বীজগণিত চর্চার অন্যতম প্রধান প্রেরণা ছিল

জ্যামিতিক-সমস্যা-উদ্ভূত প্রশ্নাবলীর সমাধান। অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন হ'লেও, এই সূত্রে সে-যুগের হিন্দুরা যে-বীজগাণিতিক আলোচনা করেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। দুরূহ ও জটীল একক- ও সহ-সমীকরণ সমাধানের অনেক দৃষ্টান্ত শতপথ ব্রাহ্মণ ও শুল্বসূত্রে পাওয়া যায়। কাত্যায়ন-শুল্বের একস্থানে কয়েকটি বর্গক্ষেত্রের সমষ্টিকে বর্গক্ষেত্ররূপে প্রকাশ করার চেষ্টায় $x^2+y^2=z^2$ এই দুই মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ বা indeterminate equation of the second degree-র সমাধান করা হয়েছে। শুল্বকার বৌধায়ন ও আপস্তম্ব উভয়েই শ্যেনাকৃতি অগ্নিবেদী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁরা এই প্রসঙ্গে যথাক্রমে

$$\frac{x}{m}+\frac{y}{n}+\frac{z}{p}+\frac{u}{q}=7\frac{1}{2},\ x+y+z+u=200$$

এবং

$$\frac{x}{m}+\frac{y}{n}+\frac{z}{p}+\frac{u}{q}+\frac{v}{r}=7\frac{1}{2},\ x+y+z+u+v=200$$

এই অনির্ণেয় সমীকরণ-সমষ্টি দু'টিকে ব্যবহার করেছেন এবং কতকগুলি বিশেষ সমাধান বা particular solution নির্ণয় করেছেন।

বৈদিক যুগের অল্প পরবর্তী কালে রচিত জৈনগ্রন্থ 'তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র'-এ $4h^2-4dh=-c^2$ এই দুই মাত্রার সমীকরণের সমাধান হিসাবে $h=\frac{1}{2}(d-\sqrt{d^2-c^2})$-কে গ্রহণ করা হয়েছে।

সমীকরণ ছাড়া বৈদিক বীজগণিতের অন্য উপজীব্য ছিল প্রগতি বা progression এবং বিন্যাস ও সমবায় বা permutation and combination। বৈদিক সাহিত্যের সর্বত্র অনেক প্রগতির ব্যবহার দেখা যায়—কোথাও বেদী-নির্মাণে বিভিন্ন সারির ইঁটের সংখ্যা নির্দেশে, কোথাও বা দান-সামগ্রীর তালিকা-বর্ণনায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই সমান্তর প্রগতি বা Arithmetical Progression-গুলির উল্লেখ আছে :

1, 3, 5, … …, 19

19, 29, 39, … …, 99

2, 4, 6, … …, 20

4, 8, 12, … …, 20

5, 10, 15, … …, 100

10, 20, 30, … …, 100

বাজসনেয়ী সংহিতায় অযুগ্ম ও যুগ্ম—এই দ্বিবিধ সমান্তর প্রগতির উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্তগুলি যথাক্রমে :

1, 3, 5, … …, 31

এবং 4, 8, 12, … …, 48

আপস্তম্ব-শুল্বে অগ্নি-বেদী নির্মাণের নির্দেশ প্রসঙ্গে এই বৃহৎ সমান্তর প্রগতিটির কথা বলা হয়েছে :

1000, 2000, 3000,… … ……

আর

24, 48, 96, 192, … …, 98304, 196608, 393216

এই সুবৃহৎ গুণোত্তর প্রগতি বা Geometrical Progres-

sion-টি আছে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে, দান-সামগ্রীর তালিকায়। প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের বিশেষ কৌশল সম্ভবতঃ বৈদিক হিন্দুদের অপরিজ্ঞাত ছিল না, যদিও বেদোত্তর বীজগণিতের মত বৈদিক বীজগণিতে সে-কৌশলের আলোচনা নেই। শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় যে, একটি সমান্তর প্রগতির প্রথম পদ 24 ও সাধারণ অন্তর 4 হ'লে, প্রগতির প্রথম সাতটি পদের যোগফল হয় 252। 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে আছে :

$$2+3+4+\cdots\cdots+1000=500499।$$

গুণোত্তর প্রগতির যোগের নিদর্শন আছে ভদ্রবাহু-কৃত কল্পসূত্রে :

$$1+2+4+\cdots\cdots+8192=16383।$$

বিন্যাস-সমবায় তত্ত্বের নাম বৈদিক বীজগণিত 'বিকল্প'। 'স্থানাঙ্গ সূত্র'-এ এ-তত্ত্বকে গণিতশাস্ত্রের একটি অঙ্গ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে বৈদিক হিন্দুর ধ্যান-ধারণার কোনও পরিচয় গণিত-ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়নি।

পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির সঙ্গে সঙ্গে গণিত-শাস্ত্রের অপর যে-শাখা সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের ভারতীয় ঋষিদের দৃষ্টি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল তা জ্যোতির্বিজ্ঞান। তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রচলিত নাম ছিল 'নক্ষত্র-বিদ্যা' ও 'জ্যোতিষ'। সে-যুগের সাহিত্যে কখনও কখনও এই গণিত-শাখাটিকে একটি মূল ও স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে উল্লিখিত হ'তে দেখা যায়। অবশ্য তখনকার ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেকাংশেই আজকের অর্থে বিজ্ঞান ছিল না—

পর্যবেক্ষণ-নিরপেক্ষ, অবাস্তব অনেক তত্ত্ব ও তথ্যের স্পর্শে তা দূষিত ছিল; তাছাড়া ভাগ্য-গণনা এবং ভবিষ্যৎ-কথনকেও সেখানে স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানের বীজ নিহিত ছিল সে-যুগের কতকাংশে অবৈজ্ঞানিক ভারতীয়—এবং ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, চৈনিক ও গ্রীক—চিন্তাধারার মধ্যে; আর শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানই নয়, বর্তমান নিখুঁত-বিজ্ঞান বা exact-science-এর প্রাচীন শাখাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অনুরূপভাবে অপবিজ্ঞান বা অর্ধবিজ্ঞানের মধ্যে জন্মলাভ করেছে।

বৈদিক যুগের প্রথমদিকে হিন্দুরা ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা করতেন, শেষদিকে ৩৬৬ দিনে। ঋতু ছিল ৬টি—বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কোন কোন সংহিতায় হেমন্ত ও শিশিরকে যুক্তভাবে হেমন্ত-শিশির রূপে উল্লিখিত হ'তে দেখা যায়। এ-হিসাবে ঋতু-সংখ্যা পাঁচ। সম্ভবতঃ সূর্যের কর্কট-ক্রান্তিতে অবস্থানের সময়কে বৎসরের সুরু হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের হিসাবেই মাস-গণনা ও পঞ্জিকা-প্রণয়ন হ'ত। সৌরমাসগুলির নাম ছিল যথাক্রমে—তপস্, তপস্য, মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভস্, নভস্য, ইষ, উর্জ, সহস ও সহস্য। চান্দ্রমাসগুলি এই—ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, মার্গশীর্ষ, পৌষ ও মাঘ। চান্দ্রমাসগুলিরই অধিক প্রচলন ছিল। বৎসরে সাধারণতঃ ১২টি করে মাস থাকত, কিন্তু সৌর ও চান্দ্র গণনাপদ্ধতির অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য মাঝে

মাঝে একটি অতিরিক্ত মাস সংযোজনা করা হ'ত। এই উদ্দেশ্যে তখনকার জ্যোতির্বিদ্‌গণ ৫ বৎসরের একটি পর্যায়ক্রম কল্পনা করা সুবিধাজনক মনে করতেন। ক্রমিক বৎসরগুলির নাম ছিল—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, উদবৎসর ও ইদ্‌বৎসর।

বৈদিক হিন্দুরা নিয়মিতভাবে সূর্যের বিষুব- ও অয়নান্ত-পরিক্রমা বা equinoxes and solstices লক্ষ্য করতেন। বিশেষভাবে স্থাপিত দণ্ডের সূর্যনিক্ষিপ্ত ছায়া পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা উত্তরদক্ষিণাদি প্রধান প্রধান বিন্দুগুলি নির্ণয় করতেন—দিক-নির্ণয়ের এমন অন্যূন ৪টি পদ্ধতির বর্ণনা আছে কাত্যায়ন ও মানব শুল্বে। সূর্য যে যে দিন ঠিক পূর্ব বিন্দুতে উদিত হ'ত সেই দিনগুলি বিষুব-দিন রূপে চিহ্নিত হ'ত। সূর্যের মকরক্রান্তি থেকে কর্কটক্রান্তিতে গমন ও প্রত্যাগমনের নাম ছিল যথাক্রমে—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন।

হিন্দুরা সুপ্রাচীন কাল থেকেই রাশি-চক্র বা zodiacal belt এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আকাশে সূর্যের আপাত গতিপথ বা ecliptic-কে বৈদিক সাহিত্যে ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ বলা হ'ত। বৎসরের ১২টি বিভাগের মত রাশিচক্র তথা রবিমার্গেরও ১২টি বিভাগ পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এমন কি প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদেও একটি স্তোত্রে রবিমার্গকে ১২টি অংশে বিভক্ত চক্রের সঙ্গে তুলনা করা আছে। রাশিচক্রের ১২টি বিভাগ অর্থাৎ ১২টি রাশির নাম ছিল—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন।

কিন্তু ১২টি অংশে বিভক্ত রাশিচক্রের পরিকল্পনা ও প্রধানতঃ জীবজন্তুর নামে অংশগুলির নামকরণ করা বৈদিক হিন্দুদের একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়। ব্যাবিলন, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণের রচনাতেও অনুরূপ কীর্তির উল্লেখ আছে। এই সম্পর্কে আপেক্ষিক অগ্রগামিতার প্রশ্নটি দুর্নির্ণেয়। ইংরেজ পণ্ডিত ই. বার্গেস্‌ (E. Burgess) প্রশ্নটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে মন্তব্য করেছেন: "The use of this division, and the present names of the signs can be proved to have existed in India at as early a period as in any other country; and there is evidence less clear and satisfactory, it is true, yet of such a character as to create a high degree of probability, that this division was known to the Hindus centuries before any traces can be found in existence among any other people".—অর্থাৎ, "এই বিভাগ-প্রণালী এবং বিভাগগুলির বর্তমান নাম ভারতবর্ষে, অন্য যে কোন দেশের মতই প্রাচীন যুগে, যে প্রচলিত ছিল তা প্রমাণ করা যায়; আর খুব স্পষ্ট এবং সন্তোষজনক না হ'লেও এমন ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণও রয়েছে যার ফলে অন্যান্য জাতির চেয়ে শত শত বর্ষ আগেও এই বিভাগ-প্রণালী হিন্দুদের জানা থাকার প্রবল সম্ভাবনা।"

নভোমণ্ডলে সূর্য ও চন্দ্রের পরিক্রমণ পথের ব্যবধান বেশী নয়; তাই রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত নক্ষত্রদের সাহায্যেই

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থান খুব সহজে চিহ্নিত করা যায়। বৈদিক হিন্দুরা রাশিচক্রের দ্বাদশ বিভাগ ছাড়াও অপর এক বিভাগ-প্রণালী অবলম্বন করতেন। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফল্গুনী, উত্তর ফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মুলা, পূর্ব আষাঢ়া, উত্তর আষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদা, উত্তর ভাদ্রপদা ও রেবতী নামের ২৭টি 'নক্ষত্র' বা তারকাপুঞ্জের সাহায্যে রাশিচক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করার এই প্রণালীর উদ্দেশ্য ছিল চন্দ্রের দৈনিক গতি সঠিকভাবে অনুধাবন করা। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের আবর্তনকাল প্রায় ২৭ দিন।

চন্দ্রের আলোক যে তার নিজস্ব নয়, প্রকৃতপক্ষে তা প্রতিফলিত সূর্যালোক, এ-জ্ঞান সম্ভবতঃ বৈদিক হিন্দুদের ছিল—বৈদিক সাহিত্যে সেরূপ অর্থবোধক কতকগুলি উক্তি আছে। ঋগ্বেদে আছে যে, সূর্য-বিনির্গত অমৃত পান করে চন্দ্র শুক্লপক্ষে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ন আর কৃষ্ণপক্ষে তৃষ্ণার্ত দেবতারা এই অমৃত শোষণ করে চন্দ্রকে পুনর্বার ক্ষীণকায় করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে পৃথিবী যে গোলাকার এমন ইঙ্গিত আছে—সেখানে পৃথিবীকে 'পরিমণ্ডল' বলে বর্ণনা করা হয়েছে আর আপস্তম্ব প্রভৃতি শুল্বে 'পরিমণ্ডল' শব্দটি বৃত্ত বা গোলকের সমার্থক। অধ্যাপক তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, ডক্টর একেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ কোন কোন বৈদিক গবেষকের ব্যাখ্যা

অনুসারে বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক গতির কথাও আছে। বেদজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত আলফ্রেড লুডভিগ্ (Alfred Ludwig)-ও ঋগ্বেদে পৃথিবীর গতির কথা উল্লিখিত আছে বলে দাবী করেন। এঁর মতে ঋগ্বেদের যুগে রবিমার্গ এবং নভোবিষুবরেখা বা celestial equator-এর মধ্যে কৌণিক ব্যবধান সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিদের মনে স্পষ্ট ধারণা ছিল। এ সব-কিছুই অবশ্য গভীর বিতর্কের বিষয়।

ঋগ্বেদের যুগে ভারতীয়রা ৫টি গ্রহের কথা জানতেন। রাশিচক্রের অন্তর্গত বা খুব নিকটবর্তী এমন অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র সম্বন্ধেও তাঁরা জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক কালের চৈনিক জ্যোতির্বিদগণের মত, সারা আকাশের নক্ষত্ররাজিকে সাধ্যমত পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করার কোন চেষ্টা সম্ভবতঃ তাঁরা করেন নি।

॥ গণিতগ্রন্থ ও গণিতবিদ্ ॥

সাধারণভাবে বৈদিক সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে অল্পবিস্তর গণিতজ্ঞানের নিদর্শন ছড়ানো আছে। এ-প্রসঙ্গে মূল বৈদিক রচনাগুলির মধ্যে যেগুলির নাম বিশেষ ভাবে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সেগুলি হচ্ছে: তৈত্তিরীয় সংহিতা,

বাজসনেয়ী সংহিতা, কাঠক সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ। কিন্তু এগুলির কোনটিই গণিতগ্রন্থ নয়—কোনটিরই মুখ্য উদ্দেশ্য গণিত চর্চা নয়। মুখ্যতঃ যা গাণিতিক রচনা এমন খুবই অল্প সংখ্যক গ্রন্থের উল্লেখ বা বিবরণ বা পরবর্তী কালে সৃষ্ট সংস্করণ আধুনিক গণিত-ঐতিহাসিকদের গোচরে এসেছে। সম্ভবতঃ ঐ-জাতীয় গ্রন্থ বিশেষ প্রণীত হয়নি; অবশ্য এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে শেষ-বৈদিক যুগে ধর্মমূলক গ্রন্থগুলিতে যে-শাশ্বত মূল্য আরোপিত হয়েছিল গণিতগ্রন্থের সে-মূল্য স্বীকৃত হয়নি আর তাই সেগুলি নিশ্চিহ্ন ভাবে বিলুপ্ত হয়েছে।

বেদাঙ্গ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত শুল্ব-গ্রন্থগুলিকেও সঠিকভাবে গণিতগ্রন্থ বলা চলে না, কারণ গণিতচর্চা সেগুলিরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তবে শুল্বগুলি জ্যামিতি ও বীজগণিতের জ্ঞানে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, অতএব পরোক্ষে গণিতগ্রন্থ হ'লেও গণিত-ঐতিহাসিকদের কাছে এগুলির সমধিক মূল্য আছে।

শুল্ব বা শুল্বসূত্র ষড়্‌বেদাঙ্গের অন্যতম কল্পসূত্রের একটি প্রশাখা। কল্পসূত্রের যে-শাখা থেকে শুল্বসূত্রের উদ্ভব তার নাম শ্রৌতসূত্র। শ্রৌতসূত্রের আলোচ্য বস্তু যজ্ঞ—নানা উদ্দেশ্যের নানা প্রকারের যজ্ঞ, আর প্রত্যেক যজ্ঞের উপযোগী সুনির্দিষ্ট বেদী-নির্মাণ হচ্ছে শুল্বসূত্রের উপজীব্য। এই বেদীর আকার-আকৃতি সম্বন্ধে বৈদিক হিন্দুরা যে সবাই সর্বাংশে একমত ছিলেন এমন নয়। আসলে আচার-অনুষ্ঠানের তারতম্যে তাঁরা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন— খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের

বৈয়াকরণিক, পাণিনি-ভাষ্যকার পতঞ্জলির এক উক্তি থেকে জানা যায় যে তাঁর সমসাময়িক কালে সহস্রাধিক বৈদিক সম্প্রদায় ছিল ; আর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন বেদী নির্মাণ পদ্ধতি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শুল্বসূত্র ছিল—যদিও সব শুল্ব-গুলিই যে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ছিল এমন নয়।' বর্তমান কালে সাতটি শুল্বের বিবরণ ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে, যথা—বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, মানব, মৈত্রায়ণ, বারাহ ও বাধুল শুল্ব। আরো দু'টি শুল্বের নাম পাওয়া গেছে—মশক শুল্ব ও হিরণ্যকেশি শুল্ব। শেষোক্ত শুল্বটির একটি উদ্ধৃতিও পাওয়া যায় আপস্তম্ব শুল্বে। প্রাপ্ত শুল্বগুলির মধ্যে বৌধায়ন শুল্ব বৃহত্তম এবং সম্ভবতঃ প্রাচীনতম। কাত্যায়ন শুল্বটিতে জ্যামিতির তত্ত্ব ও তথ্য অধিকতর সুবিন্যস্ত। মানব, মৈত্রায়ণ, বারাহ ও বাধুল শুল্বগুলি ক্ষুদ্র-কলেবর এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন জ্যামিতিক পরিচয় ওগুলি থেকে পাওয়া যায় না।

বেদের ব্রাহ্মণ অংশগুলিতে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে নির্দেশদান প্রসঙ্গে অনেক মূল্যবান জ্যোতিষীয় আলোচনা আছে। মুখ্যতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে রচিত হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে 'বেদাঙ্গ-জ্যোতিস'। এটি প্রাচীন হিন্দুদের জ্যোতিষীয় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের শেষ ভাগে বেদের পরিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে রচিত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কালে ৩৬০ দিনের পরিবর্তে ৩৬৬ দিনে বৎসর গণনা করা হ'ত। প্রধান প্রধান গ্রহ ও তাদের কক্ষপথগুলি সম্পর্কে জ্ঞানও তখন অনেক উন্নত। মোটামুটি ভাবে বেদাঙ্গ-

জ্যোতিষ অবলম্বনে লিখিত প্রায় সমসাময়িক কালের অপর একটি গ্রন্থের নাম 'যাজুষ জ্যোতিষ'।

সাধারণ ভাবে জ্যোতিষ-সংহিতা নামে পরিচিত সুপ্রাচীন কালের আরো কতকগুলি জ্যোতিষীয় গ্রন্থের কথা ঐতিহাসিক-দের জানা আছে। এগুলির সঠিক রচনাকাল এখনও স্থিরীকৃত হয়নি, তবে বৈদিক যুগের শেষ ভাগেই রচনা শুরু হয়। জ্যোতিষ-সংহিতাগুলির মধ্যে 'গর্গসংহিতা'র একখানি ছিন্ন সংস্করণ আবিস্কৃত হয়েছে—অপরাপর সংহিতাগুলির শুধুমাত্র উল্লেখ বা আলোচনা পাওয়া গেছে পরবর্তী জ্যোতির্বিদগণের রচনায়। উল্লেখপ্রাপ্ত সংহিতাগুলির মধ্যে 'গর্গসংহিতা' ও 'পরাশর সংহিতা' প্রধান; আরো দু'টি সংহিতার নাম 'দেবল-সংহিতা' ও 'কাশ্যপসংহিতা'।

প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখপ্রাপ্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে বৃদ্ধ গর্গ ছিলেন প্রাচীনতম। ইনি সম্ভবতঃ পাণ্ডবদের সমসাময়িক ছিলেন। মহাভারতের একাধিক স্থানে তাঁর নাম আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতানুসারে ভারতযুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খৃষ্ট পূর্ব ১০০০ অব্দের অনুরূপ কালে। বৃদ্ধ গর্গ রাজা পৃথুর সভা-জ্যোতিষী ছিলেন এবং সরস্বতী নদীর তীরে কোথাও বাস করতেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর আশ্রমে শিক্ষার্থীর সমাগম হ'ত। বৃদ্ধ গর্গের পরে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন লগ্ধ বা মতান্তরে লগধ। ইনি 'যাজুষ জ্যোতিষ' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। অয়নান্ত বিন্দু বা solsticial point দুইটির

অবস্থান সংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা এঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পরবর্তীকালে লল্ল-প্রদর্শিত পথে আরো গবেষণা করেন গর্গ ও পরাশর। ঋষিপুত্র, কপিলাচার্য, কশ্যপ, কাশ্যপ, দেবল প্রভৃতি আরো কয়েকজন গণিতজ্ঞের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু কাশ্যপ ও দেবল প্রণীত দু'টি গ্রন্থের নাম ছাড়া এঁদের সম্বন্ধে আর প্রায় কিছুই জানা যায় না।

বৌধায়ন প্রভৃতি জগৎবরেণ্য গণিতবিদ্‌দের সম্বন্ধেও, শুল্ব গ্রন্থগুলির প্রসঙ্গে সামান্য কিছু তথ্য ছাড়া, ব্যক্তিগতভাবে কিছুই জানা যায়নি। মজুমদার-পুসালকার সম্পাদিত মহাগ্রন্থে এঁদের কার্যকাল খৃষ্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৪০০ অব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিভূতিভূষণ দত্ত আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে লিখেছেন যে, বৌধায়নের কাল খৃষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দের অনুরূপ।

উল্লিখিত শুল্বকারগণের হাতে বৈদিক ভারতে জ্যামিতির প্রভূত উন্নতি হয়—কিন্তু জ্যামিতিবিদ্যার সূত্রপাতের কৃতিত্ব হয়তো আরো আগের যুগের অজ্ঞাতনামা কয়েজন মনীষীর। বৌধায়ন ও আপস্তম্ব শুল্বের অনেক জায়গায় অনেক তথ্য ব্যবহার করার পরেই বলা আছে : "ইতি বিজ্ঞায়তে", অথবা "ইতি অভ্যুপদিশন্তি", অথবা "ইতি উক্তম্"। গার্বে, দত্ত প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ থেকে সংগৃহীত : কিন্তু দুঃখের বিষয় বৌধায়ন-আপস্তম্ব-শুল্বে কোথাও পূর্বসূরীদের নাম বা অন্য কোন পরিচয়ের উল্লেখ নেই।

বেদোত্তর যুগ

পটভূমিকা ঃ প্রধান প্রধান গণিত গ্রন্থ ও গণিতবিদ্ ঃ
গণিতজ্ঞান ও অবদান

॥ পটভূমিকা ॥

বৈদিক যুগের সকল সময়েই ভারতবর্ষে গণিতের তথা বিজ্ঞানের তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির মান সমান উন্নত ও গৌরব-জনক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই যুগের প্রথম ভাগে মননক্রিয়ার যে ব্যাপক চর্চা ও উৎকর্ষ হয় শেষভাগে তার ধারা অনেক পরিমাণে ক্ষীণ। প্রধানতঃ বেদের সংহিতা অংশগুলি এই প্রথম ভাগে রচিত হয়, আর শেষ ভাগে ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হয় ব্রাহ্মণ অংশগুলি, উপনিষদ্ ও সূত্র সাহিত্য।

সংহিতার রচনাকালে ভারতীয় আর্য-সমাজে বৃত্তি অবলম্বনের ব্যাপারে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছিল না। আপন আপন রুচিপ্রবৃত্তি ও সুযোগসুবিধা অনুসারে বৃত্তিনির্বাচনের স্বাধীনতা সকলেরই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সমাজে এই সময়ে জাতিভেদ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করে। জাতি ও বৃত্তি নির্ণয় হয় জন্মনির্ভর, কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের পুরুষরাই বিদ্যাচর্চার অধিকার লাভ করেন এবং বিভিন্ন কারিগরিবৃত্তিগুলি নীচ বলে গণ্য হ'তে থাকে। সংহিতার সূত্রগুলিতে আর্যঋষিদের যে মুক্ত বুদ্ধি, সত্যসন্ধানী মনোভাব ও স্বাধীন চিন্তাধারার প্রতিফলন পাওয়া যায় ব্রাহ্মণাদি সাহিত্যে তার অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এই সাহিত্য প্রধানতঃ সংহিতাগুলির ভাষ্যরচনা ও নানাপ্রকার

আচার-অনুষ্ঠান বিধিনিষেধের নিষ্ফল খুঁটিনাটি আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ঘোষণা করা হয় যে, বেদ 'অপৌরুষেয়' অর্থাৎ তা মানুষের রচনা নয়। বলা হয়, বেদ 'নিত্য' অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়। উল্লিখিত বিবিধ কারণগুলির ফলে এই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখার মান যে বিশেষ অবনত হয়ে পড়ে তা একান্ত স্বাভাবিক। বেদীনির্মাণের কাজে জ্যামিতির ও কাল নির্ধারণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজন থাকায় গণিতের এই দুই শাখার কিছুটা উন্নতি এই সময়েও অবশ্য পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ ব্যাহত হয়।

বৈদিক যুগের শেষ পর্বের রাজনৈতিক অবস্থাও সুস্থ, স্বাভাবিক বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী ছিল না। সমগ্র আর্য-ভারত তখন ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালা তাদের সংখ্যাই ছিল ষোল। এগুলি 'ষোড়শ মহাজনপদ' নামে খ্যাতিলাভ করে। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটি ছিল গণতন্ত্র, অপরগুলি রাজতন্ত্র। রাজ্যগুলির মধ্যে একে অপরকে পরাভূত করে অধিকতর শক্তিশালী হবার অবিরাম চেষ্টা চলত। ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বিবাদ ছাড়া অপর এক উৎপাত ছিল বৈদেশিক আক্রমণ। আর্যাধিকারের গোড়া থেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রত্যন্ত-ভাগ নানা উপজাতির আক্রমণে প্রায়ই বিব্রত হয়ে উঠত। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে পারস্যসম্রাট কাইরাস্ ভারত



বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষ

আক্রমণ করেন। পরবর্তীকালে দেরিয়াস্ সিন্ধু-উপত্যকা ও রাজপুতানার মরুভূমি পর্যন্ত তাঁর পারসীক সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব শুধু উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকেই সংগৃহীত হ'ত।

সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এক অতি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ভারতভূমিতে বৈদিক যুগের অবসান হয়। অবস্থার ধীরে ধীরে আবার উন্নতি সুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। এই সময় থেকেই বেদোত্তর যুগের সূচনা। প্রায় দেড় হাজার বৎসর কাল পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। এই যুগে ভারতীয়রা বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে এতদূর উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন যে, এই যুগের ভারত-সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে।

সামাজিক ক্ষেত্রে শেষ-বৈদিক যুগের শ্বাসরোধকারী পরিবেশের অবসান ঘটিয়ে, চিত্তকে ভয়শূন্য ও জ্ঞানকে মুক্ত করে যাঁরা বেদোত্তর যুগের সূত্রপাত করলেন তাঁরা হলেন মানবতার পূজারী, বেদ-বিরোধী ধর্ম-আন্দোলনকারীদের দল। এই আন্দোলনকারীরা শুধু প্রচলিত ধর্মমতকে সমালোচনা বা সংস্কার করেই ক্ষান্ত হননি, মানবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি নতুন ধর্মমত প্রচারেও তাঁরা ব্রতী হন। নবপ্রচারিত ধর্মগুলির মধ্যে মহাবীর প্রচারিত জৈন ধর্ম ও গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম বেদের অভ্রান্ততা ও জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করে। কাল-

প্রবাহে ভারতভূমিতে এদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব প্রায় লোপ পেয়েছে কিন্তু বেদোত্তর যুগের সূচনায়, এই দুই ধর্মমতের প্রভাব ও গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

বুদ্ধ ও মহাবীরের ধর্ম-আন্দোলনের সমসাময়িককালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ইতিপূর্বের বহুবিভক্ত ভারতে প্রাধান্যের প্রতিযোগিতায় ৪টি রাজ্য তখন অপর রাজ্যগুলিকে জয় করে বিশেষ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই রাজ্য ৪টি অবন্তী, বৎস, কৌশল ও মগধ। অবন্তীরাজ প্রদ্যোত, বৎসরাজ উদয়ন্, কোশলের নৃপতি প্রসেনজিৎ এবং মগধের অধিপতি বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী-কালে কোশল ও মগধের প্রতিপত্তি ও রাজ্যসীমা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং সবশেষে সমগ্র উত্তর ভারতে মগধ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বিম্বিসারপুত্র অজাতশত্রুর রাজত্বকালে মগধের সীমা হিমালয় থেকে ছোটনাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতভূমিতে ঐক্যবদ্ধ বিশাল রাজ্যগঠনের এটাই সূচনা। পরে এক সময়ে মগধের রাজশক্তি দাক্ষিণাত্যসহ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে একতাবদ্ধ করেছিল।

ভারত-ইতিহাসে বেদোত্তর যুগের বিস্তৃতি প্রায় দেড় হাজার বৎসর কাল। বেদোত্তর তথা প্রাচীন যুগের অবসানে যে-যুগের সূচনা ইতিহাসে তা মুসলিম যুগ বা মধ্য যুগ নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে, ১১৯২ সালে, তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কাবুল-গজনীর শাসনকর্তা মহম্মদ ঘুরীর কাছে


অশোকের সমকালীন
মৌর্য সাম্রাজ্য
শিলানুশাসন... ... ...
স্তম্ভানুশাসন... ... ...
সম্ভাব্য সীমা... ...
শাহবাজগড়ি
তক্ষশিলা
কালসি
বিরাট
ইন্দ্রপ্রস্থ
শ্রাবস্তী
কপিলাবস্তু
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
উজ্জয়িনী
সাঁচী
সুরাষ্ট্র
গির্ণার
নর্মদা নং
তাম্রলিপ্তি
সোপারা
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
সিদ্ধপুর
সত্যপুত্র
চোল
পাণ্ড্য
তাম্রপর্ণী

আজমীঢ়ের চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের মাধ্যমে ইতিহাসের এই যুগ-পরিবর্তন সাধিত হয়। ইতিপূর্বে অবশ্য ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত ও গুরুতররূপে আহত করেন, কিন্তু শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন না করে অহেতুক উদারতার অথবা সামরিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন —ইতিহাসের নতুন গতিপথের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

বেদোত্তর ভারতের সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করা স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীনতর ভারতের মত দুঃসাধ্য নয়। এ-যুগের অসংখ্য শিলালিপি, ধাতুফলক, উৎকীর্ণ পাত্র, মুদ্রা, গ্রন্থ প্রভৃতি ভারতবর্ষের মধ্যে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-সংস্কৃতির সূত্রে তৎকালীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দেশে পাওয়া গেছে। আর, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে প্রাচীন ভারতকে জানার যে-আগ্রহ ও উৎসাহ দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তার সুফলে অনেক ঐতিহাসিক উপাদানেরই সদ্ব্যবহার হয়েছে।

কয়েকজন বিদেশী পর্যটকের বেদোত্তর ভারত পরিভ্রমণের বিবরণ ভারত-গবেষকদের খুব সাহায্য করেছে। তাঁদের মধ্যে আরব মনীষী আল্‌বীরূনীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গণিতাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, উদার, নির্ভীক এই জ্ঞানসাধক বেদোত্তর যুগের শেষ দিকে ভারতবর্ষে আসেন এবং তীক্ষ্ণ, গভীর মননের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দুদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য বিষয় অনুশীলন করেন। তাঁর রচনা 'তহ্‌কিক্‌-ই-হিন্দ' প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে সবচেয়ে মূল্যবান রচনাগুলির অন্যতম।

বেদোত্তর যুগে বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে অনুকূল-অর্থ-নৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে অর্থাৎ ৩২১ থেকে ১৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রশংসনীয় প্রগতি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে কুষাণ নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় অবস্থার আরও উন্নতি হয়, এবং গুপ্তযুগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৩২০ থেকে ৪৯৬ অব্দে সাধারণভাবে কলা ও বিজ্ঞান চর্চা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। অবশ্য গণিতশাস্ত্রের, বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের, কতকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্ক্রিয়া গুপ্তযুগের পরেও সংঘটিত হয়েছে।

॥ প্রধান প্রধান গণিতগ্রন্থ ও গণিতবিদ্ ॥

বেদোত্তর যুগে গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে জ্যোতিষ শাখাই ভারতীয়দের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ লাভ করে। এই কালে রচিত জ্যোতিষ-গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সিদ্ধান্ত' গ্রন্থগুলি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। উচ্চশ্রেণীর যে-কোন জ্যোতিষীর গ্রন্থ হিন্দুরা সে-যুগে সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত করতেন। এখন পর্যন্ত মোট ১৮টি সিদ্ধান্তর কথা জানা গেছে, যথা—সূর্য, পিতামহ বা ব্রহ্ম, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কাশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, রোমক বা লোমশ,

চ্যবন, যবন, ভৃগু ও শৌনক। সিদ্ধান্তগুলি কোন্ কোন্ সময়ের এবং কাদের রচনা তা জানা যায়নি। তবে এগুলি যে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে বিভিন্ন সময়ে রচিত এ-কথা মনে করার নিশ্চিত কারণ আছে।

সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। একমাত্র এই গ্রন্থটি আধুনিক ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে। অবশ্য প্রাপ্ত সূর্যসিদ্ধান্ত ও সর্বপ্রথম লিখিত সূর্যসিদ্ধান্তের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কেননা অনেক সংস্কারক ও টিকাকারদের হাতে গ্রন্থটি বহুবার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। প্রাপ্ত সূর্যসিদ্ধান্ত ১৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত একটি বৃহৎ গ্রন্থ। এটিকে হিন্দু গণিত প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করা যায়।

অপরাপর সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে জানা যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা উল্লেখ ও বিবরণ থেকে। বরাহমিহির তাঁর 'পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা'-য় পিতামহ, বশিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ, ও সূর্য সিদ্ধান্তগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। টীকাকার ভট্টোৎপলের লেখা থেকে পৌলিশ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে পারা যায়। একাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পর্যটক আল্‌বীরূনীর রচনায় পৌলিশ ও রোমক সিদ্ধান্তের বর্ণনা আছে। রোমক সিদ্ধান্তের একটি টীকাও পাওয়া যায়। এটির রচয়িতা শ্রীষেন। ব্রহ্মগুপ্ত বশিষ্ঠ সিদ্ধান্তের দুইটি সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছেন; একটির সম্পাদকের নাম বিষ্ণুচন্দ্র। সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে পিতামহ সিদ্ধান্ত সর্বনিকৃষ্ট এবং সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন

বৈদিক যুগের বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। আলোচনার ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধিতে বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত উন্নততর।

সিদ্ধান্ত ছাড়া বেদোত্তর যুগে আর এক শ্রেণীর জ্যোতিষগ্রন্থ রচিত হয়। এগুলি 'করণ' বা 'তন্ত্র' নামে অভিহিত হ'ত। এ-গ্রন্থগুলি ছিল বিষয়বস্তু অথবা আলোচনার ব্যাপ্তিতে কিছুটা সীমাবদ্ধ প্রকৃতির। আল্‌বীরূনীর ভারত বৃত্তান্তে 'খণ্ডখাদ্যক', 'করণ-তিলক', 'করণ-সার' প্রভৃতি কয়েকটি করণগ্রন্থের কথা আছে।

বেদোত্তর যুগের একেবারে গোড়ার দিকের তিনটি জ্যোতিষীয় গ্রন্থের নাম—'সূর্য প্রজ্ঞপ্তি', 'চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তি', 'ভদ্র বাহবীয় সংহিতা'। এই গ্রন্থ জৈন ধর্মাবলম্বীদের রচনা। বৈদিক যুগের গ্রন্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পরবর্তী হলেও জৈন জ্যোতিষগ্রন্থগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক ও অশুদ্ধ জ্ঞানের পরিচায়ক। এ-ঘটনা সম্ভবতঃ ধর্মীয় বিদ্বেষের কুফল।

বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে পেশোয়ারের অদূরবর্তী বখ্‌শালী গ্রাম থেকে ঐতিহাসিকরা বেদোত্তর যুগের একটি গাণিতিক পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। গণিতের ইতিহাসে 'বখ্‌শালী পাণ্ডুলিপি' বা 'Bakhshāli manuscript' নামে পরিচিত এই গ্রন্থটি সে-যুগে কাগজরূপে ব্যবহৃত ভূর্জপত্রে অর্থাৎ বার্চ্ (birch) জাতীয় গাছের ছালে লিখিত; এর ভাষা সংস্কৃত, লিপি 'সারদা'। পাণ্ডুলিপির অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ, পাঠোদ্ধার অতিশয় দুঃসাধ্য। কিন্তু গবেষকদের অক্লান্ত চেষ্টায় এ-পাণ্ডুলিপি থেকে অনেক তথ্য সংগৃহীত

হয়েছে। গ্রন্থটিতে পাটীগণিত ও বীজগণিতের অনেক সমস্যা ও সমাধান-পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে গভীর মত-পার্থক্য আছে—বিভূতিভূষণ দত্তর মতে ২০০ খৃষ্টাব্দের অনুরূপ সময়, হোর্নলে (Hoernle)-এর মতে তৃতীয় বা চতুর্থ শতক, আবার কেয় (Kaye)-এর বিচারে দ্বাদশ শতাব্দী বা আরও কিছু পরে। কিন্তু গ্রন্থটি যে বেদোত্তর হিন্দু যুগের সে-সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নেই; আর বর্তমানকালের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থ 'দি হিস্ট্রী এ্যাণ্ড কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল্'-এ দত্তের মতই সমর্থিত হয়েছে।

বেদোত্তর ভারতের গণিতবিদ্‌গণের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য তিনি আর্যভট। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ইনি সাধারণতঃ কুসুমপুরের আর্যভট নামে উল্লিখিত হ'তেন। পাটলিপুত্রের—আধুনিক পাটনার—কাছে কুসুমপুর ছিল এঁর কর্মক্ষেত্র, সম্ভবতঃ সেখানেই ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর 'আর্যভটীয়' গ্রন্থটি বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে। এটি তাঁর মাত্র ২৩ বৎসর বয়সের রচনা। প্রাচীন সাহিত্যে আর্যভটের আরও একটি গ্রন্থের কিছু কিছু উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আর্যভট ছিলেন 'সূত্রকার'—কেবলমাত্র গাণিতিক ফল ও সিদ্ধান্তগুলি তিনি অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করতেন, বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা গবেষণাপদ্ধতির আলোচনা তাঁর রচনায় নেই। অনুমান করা যায় যে, এইগুলি তিনি শিষ্যদের কাছে মৌখিকভাবে করতেন।

আর্যভটীয় গ্রন্থটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, যথা—দশ-গীতিকা, গণিতপাদ, কালক্রিয়া ও গোলপাদ। গণিতপাদে জ্যোতিষচর্চার পক্ষে প্রয়োজনীয় তেত্রিশটি বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। প্রক্রিয়াগুলি পাটীগণিত, বীজগণিত ও সমতল ত্রিকোণমিতি বা Plane Trigonometry-র। একস্থানে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে ৩·১৪১৬ দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। স্মরণীয় যে আধুনিক হিসাবে উক্ত অনুপাত 'পাই' (π)=৩·১৪১৫৯। আর্যভটীয়ের অপর তিন পরিচ্ছেদ জ্যোতির্বিদ্যা ও গোলক-ত্রিকোণমিতি বা Spherical Trigonometry সম্পর্কে। এই আলোচনার প্রধান অবলম্বন সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলি। কিন্তু আর্যভট সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের অনেক মূল্যবান পরিবর্তন সাধন করেন। এ-প্রসঙ্গে গোলপাদে তিনি লিখেছেন যে, জ্ঞান সমুদ্রের তলায় অনেক রত্ন ছিল—কতক আসল, কতক নকল; তিনি নিজের বিচারবুদ্ধির সাহায্যে কেবল আসলগুলি সংগ্রহ করেছেন। আর্যভটের চিন্তা- ও পর্যবেক্ষণ-প্রসূত কয়েকটি ফলাফল বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে সম্মানিত হওয়ার যোগ্য। আর্যভটই প্রথম, তাঁর দশগীতিকায়, পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা ঘোষণা করেন।

আর্যভট হিন্দু জ্যোতিষে 'ঔদয়িক' ও 'আর্ধরাত্রিক' নামে দুইটি বিকল্প গণনা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। প্রথমটিতে সূর্যোদয় এবং দ্বিতীয়টিতে মধ্যরাত্রি থেকে দিবসারম্ভ পরিগণিত হ'ত।

আর্যভটের জ্যোতিষীয় মতবাদ ও পদ্ধতি সমসাময়িক

জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর শিষ্য ও অনুবর্তীদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হন, যথা—লাটদেব, ভাস্কর, পাণ্ডুরঙ্গস্বামী নিঃশঙ্ক ও লল্ল। সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন লাটদেব। ইনি রোমক, পৌলিশ ও সূর্য সিদ্ধান্তগুলির ব্যাখ্যা রচনা করেন। গুণীসমাজ তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'সর্বসিদ্ধান্তগুরু'। ভাস্কর ভারতীয় গণিতেতিহাসে সাধারণতঃ ১ম ভাস্কর নামে উল্লিখিত হন। ইনি ৫৭৮ খৃষ্টাব্দের সমসায়িক। আর্যভটের জ্যোতিষীয় মতবাদের দু'টী টীকা, 'লঘু ভাস্করীয়' ও 'মহা-ভাস্করীয়', এঁর রচনা। আর্যভটীয়ের একটি সমালোচনা গ্রন্থও ইনি রচনা করেন। লল্ল 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি নিঃসন্দেহে আর্যভটপন্থী ছিলেন, কিন্তু আর্যভটের সমসাময়িক ছিলেন কিনা সে-সম্বন্ধে গভীর মত-পার্থক্য আছে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'খণ্ডখাদ্যক' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, লল্লর কার্যকাল ছিল ৭৪৮ খৃষ্টাব্দের অনুরূপ সময়। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদীর মতে লল্ল ৪৯৮ অব্দের সমসাময়িক।

সুবিখ্যাত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থের প্রণেতা বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করেন মগধ রাজ্যে—আধুনিক দক্ষিণ বিহারে—আনুমানিক ৫০৫ খৃষ্টাব্দে। 'বৃহৎ-সংহিতা' নামে এঁর আরও একটি গ্রন্থ ছিল। গ্রন্থ দু'টিতে বরাহমিহিরের নিজস্ব মৌলিক চিন্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এগুলি

ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যব্যন। কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের বর্তমান জ্ঞান প্রধানতঃ বরাহমিহিরের লেখা থেকে সংগ্রহ করা। বরাহমিহির আর্যভট ও লাটদেব ছাড়া পূর্ববর্তী আরও কয়েকজন জ্যোতির্বিদের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন—সিংহাচার্য, প্রত্যুম্ন ও বিজয়নন্দীর কথা। প্রত্যুম্ন মঙ্গল ও শনিগ্রহের এবং বিজয়নন্দী বুধগ্রহের সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা করেছিলেন বলে জানা যায়। বিজয়নন্দী বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত গ্রন্থটির একটি সংস্করণও রচনা করেন। প্রত্যুম্ন ও বিজয়নন্দী বরাহমিহিরের পূর্ববর্তী, কিন্তু আর্যভটেরও পূর্ববর্তী কিনা সে-কথা সঠিকভাবে জানা যায় না।

ব্রহ্মগুপ্ত, বিখ্যাত বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক সার্টন (Sarton)-এর ভাষায় ছিলেন "One of the greatest scientists of his race and the greatest of his time."—অর্থাৎ, "তাঁর স্বজাতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর সমকালীনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" ইনি ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যভারতের উজ্জয়িনী ছিল এঁর কর্মস্থল। এঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'ব্রাহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত'। এটি তাঁর ৩০ বৎসর বয়সের অর্থাৎ ৬২৮ খৃষ্টাব্দের রচনা। পরিণত বয়সে, ৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি 'খণ্ডখাদ্যক' নামে আরও একটি গ্রন্থ লেখেন। এটি একটি করণগ্রন্থ। ব্রহ্মগুপ্তর রচনাতে সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ ও আর্যভটীয়ের ব্যবহার আছে, কিন্তু তিনি পূর্বের বহু গণনারীতির অত্যন্ত মূল্যবান সংস্কার সাধন করেন। জ্যোতিষে তাঁর নিজস্ব মৌলিক অবদানও কিছু কম নয়। পরবর্তী জ্যোতির্বিদগণ

সকলেই ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতি ও গণনার ফল ব্যবহার করতেন। ব্রহ্মগুপ্ত রচিত গ্রন্থ দু'টি সমসাময়িক ও পরবর্তী কালে, স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্যের পণ্ডিতরা আরবী ও ফার্সী ভাষায় এগুলির অনুবাদ প্রকাশ করেন। ব্রাহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তের আরবী নাম 'সিন্দ্‌হিন্দ্‌'। এটি সম্ভবতঃ ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন্‌ ইব্রাহিম আল্‌ ফাজারী কর্তৃক অনূদিত। খণ্ডখাদ্যকের আরবী অনুবাদ 'অলর্কন্দ্‌' নামে পরিচিত। সমকালীন পণ্ডিতদের তুলনায় ব্রহ্মগুপ্ত আরও অনেক বেশী অগ্রগামিতার পরিচয় দেন বিশুদ্ধ গণিতের ক্ষেত্রে। ব্রাহ্ম-স্ফুট সিদ্ধান্তের ২টি পরিচ্ছেদ পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি সম্পর্কে। এখানে ত্রৈরাশিক, সমান্তর প্রগতি, ১ম ও ২য় মাত্রার নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সমীকরণ, বৃত্তস্থ ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর ব্যবহৃত অনেকগুলি গাণিতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আজকের অনুরূপ প্রক্রিয়ার কোনও তফাৎ নেই। জ্যামিতিতে 'ব্রহ্মগুপ্তের উপপাদ্য' নামে পরিচিত প্রতিজ্ঞাটি আজও তাঁর অবিস্মরণীয় প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে।

ব্রহ্মগুপ্ত খণ্ডখাদ্যকে আর্যভটের আর্ধরাত্রিক গণনাপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আর্যভট-প্রস্তাবিত পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং আরও কয়েকটি বিষয়ে তিনি আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি, বিশেষতঃ প্রথম জীবনে, তীব্রভাবে এগুলির সমালোচনা করতেন। দুঃখের বিষয়, এই সমালোচনার ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী বৈজ্ঞানিক জনোচিত ছিল না, এমন কি আর্যভট

সম্পর্কে ব্যক্তিগত কটাক্ষও এতে স্থান পেয়েছিল। ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও প্রভাবের জন্য পূর্বসূরী সম্পর্কে ঈর্ষাই সম্ভবতঃ এর কারণ।

ব্রহ্মগুপ্তের রচনা দু'টি, বিশেষ করে খণ্ডখাদ্যক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতীয় জ্যোতিষে সবিশেষ সমাদর পেয়েছে। পরবর্তী প্রায় ৬ শতাব্দী ধরে খণ্ডখাদ্যকের অনেকগুলি টীকা রচিত হয়। টীকাকারদের মধ্যে আছেন লল্ল, ভট্টোৎপল, পৃথূদক-স্বামী, সোমেশ্বর, বরুণ ও আমরাজ। লল্লকৃত টীকাটির নাম 'খণ্ডখাদ্যপদ্ধতি'। এই লল্ল ও 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' প্রণেতা আর্যভট-পন্থী লল্ল অভিন্ন কিনা সে-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

ব্রহ্মগুপ্তের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে গভীর গাণিতিক জ্ঞান ও বিস্ময়কর গণিত প্রতিভার জন্য ভাস্বর হয়ে আছেন ভাস্করাচার্য। মধ্যবর্তীকালের কয়েকজন গণিতবিদের নাম ও তাঁদের কিছু কিছু তৎপরতার কথাও অবশ্য উল্লেখ্য।

'লঘুমানস'-রচয়িতা মঞ্জুল বা মতান্তরে মুঞ্জাল জন্মগ্রহণ করেন ৯৩২ খৃষ্টাব্দে। লঘুমানস একটি করণ গ্রন্থ। ভারতীয় জ্যোতিষে অয়ন-চলন বা precession of the equinoxes সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য মঞ্জুলের বিশেষ খ্যাতি। তাঁর আগের আর কোনও লেখায় এই দুরূহ জ্যোতিষীয় তথ্যের স্পষ্ট এবং সবিস্তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভাস্করাচার্য তাঁর রচনায় এই প্রসঙ্গে মঞ্জুলের গবেষণা গ্রহণ করেছেন এবং ঋণও স্বীকার করেছেন। মঞ্জুলের পরবর্তী ছিলেন শ্রীপতি। সম্ভবতঃ

১০৩৯ খৃস্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। ইনি 'ধীকোটি' ও 'সিদ্ধান্ত-শেখর' নামে দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ধীকোটী গ্রন্থটী একটি করণ গ্রন্থ। ধারারাজ ভোজ ছিলেন 'রাজমৃগাঙ্ক' করণগ্রন্থের রচয়িতা। আর 'ভাস্বতী' এই জনপ্রিয় করণ-গ্রন্থটি লেখেন শতানন্দ। এটি ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জিকা-প্রণয়নের বিশেষ উপযোগী করে লেখা হয়।

খৃষ্টীয় ৮ম থেকে ১০ম শতকের মধ্যে কয়েকজন বীজ-গণিতজ্ঞর জন্ম হয়। এঁদের নাম পদ্মনাভ, শ্রীধর ও মহাবীর। মহাবীর সম্ভবতঃ ৮৫০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর 'গণিত-সার-সংগ্রহ' গ্রন্থটি সংকলন গ্রন্থ হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান। শ্রীধরের গ্রন্থের নাম 'ত্রিশতিকা'। ইনি ৮ম বা মতান্তরে ১০ম শতাব্দীর লোক। ত্রিশতিকা এবং পদ্মনাভ-রচিত গ্রন্থের কোনটিই পাওয়া যায়নি। কিন্তু ২ মাত্রার সমীকরণ-সমাধানের একটি সাধারণ নিয়মের জন্য বর্তমানকালের বীজগণিত গ্রন্থেও শ্রীধরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

ভাস্করাচার্য বা দ্বিতীয় ভাস্কর—সর্বকালের সর্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই গণিতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেন বেদোত্তরযুগের শেষদিকে, ১১১৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারতের বিজ্জবিড় বা বিজাপুরে। ভারতীয় গণিতের সমগ্র ইতিহাসে ভাস্করাচার্যের কোনও সমকক্ষ নেই, এ-কথা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। গণিতশাস্ত্রের প্রায় সকল শাখাই তাঁর প্রতিভার স্পর্শের গৌরবময় সাক্ষ্য বহন করছে। ভাস্করাচার্যর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' ১১৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। তাঁর অপর

দুইটি গ্রন্থের নাম 'করণ-কুতূহল' ও 'সর্বতোভদ্র যন্ত্র'। প্রথমটির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১১৮৩ সাল।

সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থটি চার খণ্ডে বিভক্ত, যথা—লীলাবতী, বীজগণিত, গ্রহ-গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায়। শেষ ২টি খণ্ড জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক। ভাস্করাচার্যের পাটীগণিতের নাম কেন লীলাবতী হ'ল সে সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে যে, লীলাবতী ছিলেন ভাস্করের বাল্যবিধবা বা অনূঢ়া কন্যা; এই কন্যাটির অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যেই সিদ্ধান্ত-শিরোমণির পাটীগণিত অংশটি বিশেষভাবে রচিত আর কন্যার নামানুসারেই এই নামকরণ। অপর এক প্রবাদানুসারে, নিঃসন্তানা দুঃখিনী স্ত্রীর লীলাবতী নাম থেকে গ্রন্থের ঐরূপ নাম। সিদ্ধান্ত-শিরোমণির একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থটি শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত সূত্রের সমষ্টি নয়, সঙ্গে গদ্যে রচিত বিশদ আলোচনাও আছে। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি গণিতের প্রায় সকল শাখার গভীর সুসংবদ্ধ জ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিচয় সিদ্ধান্ত-শিরোমণির সর্বত্র আছে। কিন্তু গণিতশাস্ত্রের যে-শাখায় ভাস্করের মনীষার চরম বিকাশ হয়েছে তা বীজগণিত। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত ভারতবিদ্বেষী তাঁরাও এ-ব্যাপারে গভীর বিস্ময় ও প্রশংসা না করে পারেন নি। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থ আরবের পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি ও সমাদর অর্জন করে। তাঁদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জগৎ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এর কথা জানতে পারে।

ভাস্করাচার্যের পরেই বেদোত্তর ভারতে গণিতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অবসান। প্রকৃত পক্ষে, একজন ঐতিহাসিকের উক্তির প্রতিধ্বনি ক'রে বলা যায় যে, ভাস্করের প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রদীপ্ত হ'লেও তাঁর আবির্ভাব-কালকে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যাহ্ন বলা যায় না। তাঁর আগে থেকেই এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। দীপ নেভার আগে যেমন শেষবারের মত অস্বাভাবিক দ্যুতিতে জ্বলে ওঠে, বেদোত্তর ভারতে ভাস্করের আবির্ভাব অনেকটা সেই রকম।

॥ গণিত জ্ঞান ও অবদান ॥

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভারতভূমিতে বেদোত্তর যুগের সুরু। এই যুগের অন্যতম প্রধান গণিতকৃতি সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলি আনুমানিক খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত। আর বেদোত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম আর্যভট জন্মগ্রহণ করেন ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে। এর মধ্যবর্তী কালের, অর্থাৎ বেদোত্তর অথচ সিদ্ধান্ত ও আর্যভটের পূর্ববর্তী, কোন গাণিতিক রচনা বা গণিতবিদ্‌কে খুব উঁচু আসন দেওয়া যায় না। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, পৃথিবীর গণিতেতিহাসে ভারতের সর্বোত্তম অবদান, সর্বকালের সর্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিত-

কীর্তি এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। এই কালেই হিন্দুরা দশমিক স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতি বা decimal place-value notation এবং শূন্য এই সংখ্যাটি আবিষ্কার করেন। উত্তরকালের ভারত তথা বিশ্বের, গণিত তথা সমগ্র বিজ্ঞানের পক্ষে এই দুই আপাতক্ষুদ্র, অতি ' মৌলিক আবিষ্ক্রিয়ার ফল অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক।

হিন্দুদের স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতিকে দশমিক বলা হয়। কারণ এই পদ্ধতিতে স্থানীয় মানগুলি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরোত্তর দশগুণ করে বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ৪৪ সংখ্যাটিতে এককস্থানের ৪টির যে-মূল্য, দশকস্থানের ৪টির মূল্য তার দশগুণ বেশী। দশকে একক ধরে গণনা এবং সংখ্যাগঠনের পদ্ধতি অবশ্য বৈদিক ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল। আর বৈদিক ভারত ছাড়া ব্যাবিলন, প্রাচীন মিশর, প্রভৃতি দেশেও এর অল্পবিস্তর প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ প্রাচীন সভ্য জগতের বিভিন্ন অংশে পরস্পর নিরপেক্ষভাবেই এ-নিয়ম আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে, আর এ-অনুমান অসঙ্গত নয় যে, হাতের দশটি আঙুলই এ-আবিষ্কারের প্রেরণা। কিন্তু দশমিক গণনাপদ্ধতি ও দশমিক স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতির মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নেই—দশমিকতা দ্বিতীয় পদ্ধতিটির একটি নেহাতই গৌণ দিক। গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দিক থেকে তাই এ-দু'য়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না, আর সেই কারণেই দ্বিতীয়টির উদ্ভাবক হিসাবে বেদোত্তর হিন্দুদের অপরিসীম মর্যাদা।

গণিতের অগ্রগতির পক্ষে, সংখ্যাকে প্রতীক বা symbol-এ প্রকাশ করা একটি অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ-প্রচেষ্টা তাই প্রাচীন সভ্যতার সকল দেশগুলিই করেছে। এই পদ্ধতিগুলিতে প্রতীকগুলি দুই শ্রেণীর—মূল আর যৌগিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বেদোত্তর হিন্দুদের পদ্ধতি অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে ৭ ও ৫ দু'টি মূল প্রতীক, আর ৭৫৫ একটি যৌগিক প্রতীক। এখন, কোন পদ্ধতিতে মূল প্রতীকের সংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল, আবার বৃহৎ সংখ্যাবোধক যৌগিক প্রতীকগুলিও সুদীর্ঘ না হওয়া বাঞ্ছনীয়। দূর অতীতে কিউনীফর্ম (Cuneiform) লিপির সাহায্যে ব্যাবিলনীয়েরা, হাইয়েরোগ্লিফিক্ (Hieroglyphic) ও হাইয়েরাটিক্ (Hieratic) লিপির সাহায্যে মিশরীয়েরা এবং গ্রীক বর্ণমালা ও একটি ফিনিশীয় বর্ণের সাহায্যে গ্রীকেরা নানা পদ্ধতির সৃষ্টি করেছেন। খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপির সাহায্যে খৃষ্টপূর্ব যুগের ভারতীয়েরাও এ-ব্যাপারে চেষ্টার ক্রটী করেননি। কিন্তু উল্লিখিত সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্নে, এ-সকল প্রচেষ্টার কোনটিই সন্তোষজনক হয়নি। ছোট ছোট সংখ্যার ক্ষেত্রে অসুবিধা না থাকলেও, বড় রাশিগুলির ব্যাপারে এ-সব পদ্ধতি ছিল একান্ত অনুপযোগী। এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটির জন্যে একটি এবং ০ মাত্র এই দশটি প্রতীকের সাহায্যে সংখ্যা-প্রকাশের যে-পদ্ধতি বেদোত্তর হিন্দুরা সৃষ্টি করেন, তাতে যে-কোন পূর্ণসংখ্যা—তা যত বড়ই হোক—অত্যন্ত সহজে প্রকাশ করা যায়। প্রতীকগুলির মধ্যে ০ প্রতীকটির

পরিকল্পনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন, উচ্চশ্রেণীর বিমূর্ত-চিন্তার পরিচায়ক। আটশ' দুই সংখ্যাটিকে প্রতীকে প্রকাশের কথা বিবেচনা করা যাক। দশমিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে এটিকে প্রকাশ করতে হ'লে শতকের ঘরে ৮, দশকের ঘরে ০ এবং এককের স্থানে ২ লিখতে হবে। এখন দশকের ঘরের ফাঁকটি ০ এই এক অর্থে মূল্যহীন অথচ অন্য অর্থে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকের সাহায্যে পূর্ণ করার উপায় না থাকলে যে আলোচ্য অঙ্কপাতন পদ্ধতি অসার্থক হয়ে পড়ে তা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুতঃ এটাই আলোচ্য পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় কারণ।

আটশ' দুই আর বিরাশী—সংখ্যা দুটিতে কত শত পার্থক্য! আর সে-পার্থক্য আজকে বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীর যে কোন ছাত্র কত সহজে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু এমন দিন ছিল যেদিনের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের কাছেও এই উপলব্ধ পার্থক্যকে প্রকাশ করা ছিল দুরূহতম সমস্যা।

স্থানীয় মান পদ্ধতি শুধু যে সংখ্যা প্রকাশের পথকেই সুগম করেছিল তা নয়, যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলিকে এবং সাধারণভাবে সমগ্র পাটীগণিতকে নতুন রূপ দিয়েছিল। বিশ্ববিশ্রুত গণিত-ঐতিহাসিক অধ্যাপক সার্টন-এর ভাষায়, "...this was not simply a matter of new symbols but a radically new arithmetic."—অর্থাৎ, "...এ-শুধু নতুন প্রতীকের ব্যাপার নয়, এ এক সম্পূর্ণ নতুন পাটীগণিত।" আর পরোক্ষভাবে এ-পদ্ধতির ফলাফল আরও

দূরপ্রসারী। জ্যামিতির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রগতি সত্ত্বেও পাটীগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতিতে প্রাচীন গ্রীসের অবদান যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, "...the difficulties they experienced in using their awkward number system, for this was based on their alphabet.…Such a method of numbering is very clumsy. The Greeks found it so, with the result that little progress was made with numbers—most of their calculations being done on the bead frame—so they branched out into geometry instead."—অর্থাৎ, "...তাঁদের অক্ষর ভিত্তিক অকেজো অঙ্কপাতন পদ্ধতির অসুবিধা।...এ-পদ্ধতি খুবই অস্বাচ্ছন্দ্যকর। গ্রীকরা তা অনুভব করতেন, যার ফলে সংখ্যার ক্ষেত্রে তাঁদের সামান্যই অগ্রগতি হয়েছিল—তাঁদের বেশীর ভাগ গণনাই করতে হত গুটিকার সাহায্যে—আর তাই সংখ্যার ক্ষেত্র ছেড়ে তাঁরা জ্যামিতির ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেন।" পক্ষান্তরে, উল্লিখিত সংখ্যাভিত্তিক গণিত শাখাগুলিতে বেদোত্তর ভারত যে সমসাময়িক দেশগুলির পুরোধা ছিল তার অন্যতম কারণ স্থানীয় মান পদ্ধতি।

স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতিতে শূন্যের ব্যবহার অপরিহার্য। বস্তুতঃ প্রথমটির উদ্‌ভাবন দ্বিতীয়টির আবিষ্কার সাপেক্ষ। অনেক ঐতিহাসিকের বিবেচনায় তাই দ্বিতীয়

আবিষ্কারটিই অধিকতর কৃতিত্বপূর্ণ। তাঁদের মতে, শূন্য আবিষ্কার—শুধুমাত্র এই দাবীতেই হিন্দুরা বিশ্ব বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হওয়ার অধিকারী। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধ্যাপক হলস্টেড (Halsted) 'অন দি ফাউণ্ডেশান এ্যাণ্ড টেকনিক অফ এরিথমেটিক' পুস্তকে মন্তব্য করেছেন: "The importance of the creation of the zero mark can never be exaggerated.' This giving to airy nothing, not merely a local habitation and a name, a picture, a symbol, but helpful power, is the characteristic of the Hindu race whence it sprang. It is like coining the *Nirvana* into dynamos. No single mathematical creation has been more potent for the general on-go of intelligence and power."—অর্থাৎ, "শূন্য প্রতীকটির সৃষ্টির গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন উক্তিই অতিশয়োক্তি হ'তে পারে না। অনস্তিত্বকে এইভাবে শুধু বাসস্থান, নাম, আকার ও রূপ দানই নয়, তার মধ্যে ব্যবহারোপযোগী শক্তি প্রতিষ্ঠা করা—এ-কাজ যেমন হিন্দুদের দ্বারা সাধিত, তেমনি হিন্দুদের দ্বারাই সাধ্য। এ যেন নির্বাণ থেকে ডাইনামো প্রস্তুত করা। শক্তি ও বুদ্ধির অগ্রগতির পক্ষে এককভাবে আর কোন গাণিতিক সৃষ্টির এর চেয়ে বড় অবদান নেই।" ঐতিহাসিক ফ্রীবেরী (Freebury) তাঁর 'এ হিষ্ট্রী অফ ম্যাথম্যাটিক্স্' গ্রন্থে লিখেছেন "...how important

'nothing' really is! It has been said that introduction of zero as a definite part of a number system marks one of the most important developments in the whole history of mathematics.···The second great contribution of the Hindus was that of a decimal place notation.··· We can only emphasize once again that the introduction of zero and the use of a decimal place notation really set mathematics free,···." —অর্থাৎ, "····বাস্তবে 'অনস্তিত্ব'-র কি অসাধারণ গুরুত্ব! কেউ কেউ মতপ্রকাশ করেছেন যে, অঙ্কের মধ্যে স্বতন্ত্র, সুনির্দিষ্ট ভাবে শূন্যকে গ্রহণ করা গণিতের সমগ্র ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অন্যতম।···হিন্দুদের দ্বিতীয় মহান অবদান দশমিক স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতি।···খুব জোরের সঙ্গে এই কথাই আবার বলছি যে, গণিতের মুক্তি এনেছে শূন্য পরিকল্পনা ও দশমিক স্থানীয় মান পদ্ধতি,···।" 'মেকারস অফ ম্যাথম্যাটিক্‌স্' পুস্তকে হুপার (Hooper) হিন্দু অঙ্কপাতন পদ্ধতিকে "the new and revolutionary method" —অর্থাৎ, "অভিনব বৈপ্লবিক পদ্ধতি" বলে বর্ণনা করেছেন,— বলেছেন, "···a method that was to pave the way for our modern world of science and engineering and aeronautics."—অর্থাৎ, "···এ সেই পদ্ধতি যা বর্তমান যুগের বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও নভশ্চারণ বিদ্যার পথ রচনা করেছে।"

উল্লিখিত যুগান্তকারী তাৎপর্য ছাড়া শূন্য আবিষ্কারের অন্য আরো তাৎপর্যও আছে। বিয়োগ ক্রিয়ার প্রসারিত ক্ষেত্র তার একটি নিদর্শন।

বেদোত্তর ভারতে শূন্যের প্রয়োজন-বোধ ও পরিকল্পনা অনেক প্রাচীন, হয়ত খৃষ্টজন্মের সমসাময়িক ঘটনা। কিন্তু শূন্যের বর্তমান প্রতীকটি অত প্রাচীন নয়। আদিতে এ-প্রতীকের কি রূপ ছিল তা জানা যায়নি। তবে বখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে বিন্দুর ব্যবহার দেখা যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর জনৈক কবি সুবন্ধুর রচনা 'বাসবদত্তা'তেও শূন্য অর্থে 'শূন্য-বিন্দু' কথাটি আছে। ধাতুফলক বা শিলালিপিতে শূন্য-বোধক ক্ষুদ্র বৃত্ত ব্যবহারের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে রঘোলি লিপি ও গোয়ালিয়র লিপিতে। এগুলি যথাক্রমে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর।

শূন্য সংখ্যাটি এবং স্থানীয় মান পদ্ধতি ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলে, কোন্ এক বা একাধিক গণিতজ্ঞের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়, সে-সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। এই আবিষ্কারের সময় সম্পর্কেও ঐতিহাসিকদের উত্তর অত্যন্ত অস্পষ্ট। ৮৭৬ খৃষ্টাব্দের গোয়ালিয়র লিপির সাক্ষ্যকে গ্রহণ করে অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক 'নবম শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোন এক সময়' এই কথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ দত্ত ও অভধেশ নারায়ণ সিং তাঁদের 'হিষ্ট্রী অফ হিন্দু ম্যাথম্যাটিক্‌স্' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আরো স্পষ্টভাবে সময় নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে বখ্‌শালী পাণ্ডুলিপি, আর্যভটীয় প্রভৃতি গ্রন্থ এবং তেত্রিশটি ধাতু-

অথবা শিলা-লিপিকে উপস্থাপিত করেছেন। লিপিগুলির মধ্যে যেটি প্রাচীনতম সেটি ৫৯৫ খৃষ্টাব্দের, এটিতে ৩৪৬ সংখ্যাটি স্থানীয় মান পদ্ধতিতে খোদাই করা আছে। দত্ত এবং সিং গ্রীক গণিত-ইতিহাসের একটি নজীরও ব্যবহার করেছেন। নজীরটি এই যে, কোন কোন গ্রীক গণিতবিদ বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের যে পদ্ধতি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে প্রবর্তন করেন, ব্যাপক-ভাবে গ্রীসে তার ব্যবহার সুরু হয় খৃষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে। গ্রীক গণিতের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হীথ্ এ-কথা স্বীকার করেছেন। ডক্টর দত্ত ও সিং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষেও স্থানীয় মান পদ্ধতির ক্ষেত্রে, "There should, therefore, be a gap of about eight centuries between the time of invention and its coming into popular use, just as was the case with the Greek alphabatic notation."—অর্থাৎ, "আবিষ্কার ও ব্যাপক প্রচলনের মধ্যে তাই প্রায় আট শতকের ব্যবধান থাকার কথা, যেমন হয়েছিল গ্রীকদের অক্ষর-ভিত্তিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে।" আর দীর্ঘ বিচার বিশ্লেষণের শেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন, "Epigraphic evidences show that the new system was quite common in India in the eighth century and that the old system ceased to exist in Northern India by the middle of the tenth century. This would, therefore, place the invention of our system in the period between

the first century B. C. and the third century A. D."—অর্থাৎ, "উৎকীর্ণলিপির সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় যে নতুন পদ্ধতিটি অষ্টম শতাব্দীর ভারতবর্ষে বেশ সুপ্রচলিত ছিল আর দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উত্তর ভারতে পুরানো লিপির ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। এ-ঘটনা থেকে তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে আমাদের আলোচ্য পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয় খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে।" ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে অঙ্কপাতনের একটি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন লাভের জন্য সে-যুগে যে বেশ কয়েক শতাব্দী সময় প্রয়োজন, দত্ত-সিংয়ের গ্রীক ইতিহাস-সম্মত এ-যুক্তি ও তৎপ্রসূত সিদ্ধান্ত একান্ত সঙ্গত বলেই মনে হয়। কিন্তু তবু তাঁদের সিদ্ধান্তের সত্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অস্বীকার করেছেন জি. আর. ক্যে। ইনি উপায়ান্তর না দেখে সরাসরি লিপিগুলিকে জাল বলে ঘোষণা করেছেন। অবশ্য ভারত-বিদ্বেষে ক্যে সমকক্ষহীন। সুস্থ, স্বাভাবিক, সত্যসন্ধানী কোন পাঠক ক্যে-র কোন রচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন বলে মনে হয় না।

বেদোত্তর হিন্দুদের আবিষ্কার শূন্য-সংবলিত দশমিক স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতি আজ ব্যতিক্রমহীনভাবে সভ্য জগতের সর্বত্র ব্যবহৃত। বলা বাহুল্য, এটা মোটেই কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। প্রাচীন পৃথিবীতে, বিভিন্ন অংশে অঙ্কপাতনের যতগুলি পদ্ধতি সৃষ্ট হয়েছে, হিন্দুপদ্ধতি শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে তাদের মধ্যে তুলনাবিহীন। এই পদ্ধতি তার দিগ্বিজয় যাত্রায়

সর্বপ্রথম যায় তথাকথিত মধ্যপ্রাচ্যে। সপ্তম শতাব্দীর সিরীয় পণ্ডিত সেভেরাস্ সেবোখ্ৎ-এর রচনায় ভারতীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। এটাই বোধহয় বহির্ভারতে হিন্দু পদ্ধতির প্রথম উল্লেখ। সেবোখ্তের লেখা থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই আরবীয়েরা খুব সম্ভব এই নতুন পদ্ধতির কথা জানতে পারেন। কিন্তু সম্যক্ উপলব্ধির অভাবেই হোক বা সংস্কারের পীড়নেই হোক তাঁরা প্রথমে এটিকে গ্রহণ করেননি। তারপর খলিফা আল্-মনসূর-এর রাজত্বকালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৫৩ থেকে ৭৭৪ সালের মধ্যে, ভারতবর্ষের কিছু গণিত-গ্রন্থ বাগ্দাদে আসে। এগুলির মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত 'ব্রাহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত' ও 'খণ্ড-খাদ্যক' ছিল। পূর্বে না হয়ে থাকলেও, এই সময়ে আরবীয়েরা সুনিশ্চিতভাবে হিন্দু পদ্ধতির কথা অবগত হ'ন এবং তা গ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত আরবী গণিতবেত্তা আল্-খোয়ারীজমী একটি গণিত-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে ভারতীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতির ব্যবহার ও অনুকূল প্রচার আছে।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে শূন্য-সংকলিত হিন্দুপদ্ধতি যায় ইউরোপে। সেখানকার দ্বাদশ শতাব্দীর কতকগুলি রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে এ-পদ্ধতির কিছু উল্লেখ ও ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে এর প্রচলন সুরু হয়। এ-ব্যাপারে পিসার পণ্ডিত লিওনার্দো ফিবোনাচ্চী (Leonardo Fibonacci)-র প্রচেষ্টাই সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছিল। ইনি মিশর, সিরীয়া, গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি দেশের

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করে অনেকগুলি অঙ্কপাতন পদ্ধতির কথা অবগত হয়েছিলেন। সবগুলির মধ্যে হিন্দু পদ্ধতিটিই যে শ্রেষ্ঠ এ-কথা উপলব্ধি করে, তিনি তাঁর ১২০২ সালে লিখিত 'লিবের আবাচী' (Liber Abaci) গ্রন্থে এই পদ্ধতির বিশদ্ ব্যাখ্যা, আলোচনা ও প্রচারে ব্রতী হন। ফিবোনাচ্চীর উদ্যমের সঙ্গে সমসাময়িক কালে আর যাঁরা সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার দ্য ভিলা ডিঁ (Alexander de Villa Dic) এবং জন অফ হ্যালিফ্যাক্স (John of Halifax) নামে পরিচিত দু'জন গণিতজ্ঞ প্রধান। ইউরোপে হিন্দু পদ্ধতিটির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি হিন্দু প্রতীক, এমন কি 'শূন্য' শব্দটিও গৃহীত হয়। ইংরেজী cipher শব্দটি 'শূন্য'-র আরবী রূপ 'সিফ্‌র্' থেকে সৃষ্ট, আর 'সিফ্‌র্'-এর ইটালীয় রূপ zepiro থেকে জন্মলাভ করেছে zero শব্দটি।

গণিতশাস্ত্রের প্রথম ধাপ হ'ল সংখ্যা ও পাটীগণিত। হিন্দুরা সুপ্রাচীন বৈদিক যুগেই বিরাট বিরাট সংখ্যাসমূহের কল্পনা ও নামকরণ করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের, বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিত-বিস্তার'-এ বর্ণিত একটি কাহিনীতে গণিতজ্ঞ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বোধিসত্ত্ব কোটীর ঊর্ধ্বে, উত্তরোত্তর শতগুণ ২৩টি সংখ্যার উল্লেখ করেন। শেষ সংখ্যাটি 'তল্লক্ষণ', ১-এর পর ৫৩টি শূন্য-সংবলিত। সমকালীন জৈনসাহিত্যে মহাকালের অংশ বিশেষকে 'শীর্ষ-প্রহেলিকা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই কাল পরিমাণকে সংখ্যায় প্রকাশ করতে গেলে ১৯৪টি অঙ্ক-স্থান বা notational place-এর প্রয়োজন হবে।

ক্ষুদ্র সংখ্যা পরিকল্পনার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ললিতবিস্তার ও অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ দু'টিতে—দৈর্ঘ্য ও ওজন পরিমাপ প্রসঙ্গে। ললিতবিস্তারে দৈর্ঘ্য প্রসঙ্গে আছে :

৭ পরমাণু রজ = ১ রেণু,
৭ রেণু = ১ ত্রুটি,
৭ ত্রুটি = ১ বাতায়ন রজ,
৭ বাতায়ন রজ = ১ শশ রজ,
৭ শশ রজ = ১ এডক রজ,
৭ এডক রজ = ১ গো রজ,
৭ গো রজ = ১ লিক্ষা রজ,
৭ লিক্ষা রজ = ১ সর্ষপ,
৭ সর্ষপ = ১ যব,
৭ যব = ১ অঙ্গুলী পর্ব,
১২ অঙ্গুলী পর্ব = ১ বিতস্তি,
২ বিতস্তি = ১ হস্ত,
৪ হস্ত = ১ ধনু,
১০০০ ধনু = ১ ক্রোশ,
৪ ক্রোশ = ১ যোজন।

বৈদিকযুগে যোগ, গুণ, বর্গমূল-নির্ণয় প্রভৃতি গণিত-ক্রিয়ার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, বেদোত্তর যুগে স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার পর তার পরিবর্তন-সাধন অনিবার্য হয়ে পড়ে। বখ্শালী পাণ্ডুলিপিতে এবং আর্যভট প্রভৃতির গ্রন্থে তাই এই সকল প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি আলোচিত

ও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই পদ্ধতিই ভারতবর্ষ থেকে প্রথমে—আনুমানিক ৮ম শতকে—যায় মধ্যপ্রাচ্যে, পরে সেখান থেকে ইউরোপে। বেদোত্তর ভারতের এই নতুন পদ্ধতি ও বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিগুলি মূলতঃ অভিন্ন।

বর্তমানকালের ত্রৈরাশিকের নিয়ম বা Rule of Three আবিষ্কৃত হয় বেদোত্তর ভারতে। আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির রচনায় এই নিয়মের বহুল ব্যবহার আছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ইউরোপীয় গণিতকার ডিগস্ (Digges) ত্রৈরাশিক পদ্ধতির যে বর্ণনা দেন তা ৯৫০ সালে রচিত একটি হিন্দু গ্রন্থের বর্ণনার অনুলিখন।

বৈদিক ভারতে ভগ্নাংশ ব্যবহারের যে-সূত্রপাত হয়, বেদোত্তর ভারতে তার আরও অনেক উৎকর্ষ ও প্রসার দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশকে একই হর-বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করা, কতকগুলির ভগ্নাংশের 'নিরুদ্ধ' অর্থাৎ ল. সা. গু. নির্ণয় করা প্রভৃতির বিশদ এবং সুষ্ঠু বর্ণনা মহাবীরের 'গণিত-সার-সংগ্রহ'-এ এবং ভাস্করের 'লীলাবতী'তে আছে। ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগের ক্ষেত্রে, মহাবীর তাঁর গ্রন্থে ভগ্নাংশটিকে উলটিয়ে গুণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভাগের এই সহজ নিয়মটি কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অজ্ঞাত ছিল। এ-প্রসঙ্গে, নবম শতাব্দীর হিন্দু গণিতজ্ঞ মহাবীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, ঐতিহাসিক ক্রীবেরী লিখেছেন : "It is rather surprising that this rule, which was used in the East, did not appear in Europe till the 16th

century."—অর্থাৎ, "এটা বেশ বিস্ময়ের কথা যে প্রাচ্যের এই পদ্ধতিটি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে অনাবিষ্কৃত ছিল।"

হিন্দু গণিতে শূন্যের ব্যবহার গণিত ঐতিহাসিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সংখ্যাটি দিয়ে যোগ, বিয়োগ ও গুণের অনেক দৃষ্টান্ত বেদোত্তর যুগের প্রায় সকল গণিত গ্রন্থেই আছে। সংখ্যাটির সংজ্ঞা ও ধর্ম বিশদভাবে আলোচিত আছে 'ত্রিশতিকা', 'লীলাবতী' এবং আরো কয়েকটি রচনায়। 'লীলাবতী'তে এবং দ্বিতীয় আর্যভটকৃত 'মহাসিদ্ধান্ত'-য়, শূন্য সম্পর্কে বর্গ, ঘন, বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ফলাফলও দেওয়া আছে। অর্থাৎ, আধুনিক গণিতের ভাষায় সংক্ষেপে বলতে গেলে: $a+0=a$, $a-0=a$, $a\times 0=0$, $0^2=0$, $\sqrt{0}=0$, $0^3=0$, $\sqrt[3]{0}=0$ প্রভৃতি গাণিতিক সম্পর্কগুলি হিন্দু পাটীগণিতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু, বিস্ময়ের ব্যাপার, শূন্যের সাহায্যে ভাগের প্রশ্নে সকল হিন্দু গণিতবিদই নীরব অথবা দুর্বোধ্য! একমাত্র ব্যতিক্রম মহাবীর। এঁর মতে কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে সংখ্যাটি অপরিবর্তিত থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিক গাণিতিক বিচারে শূন্যর সাহায্যে ভাগ করা যায় না অথবা ভাগফল সসীম বা finite হয় না। অনেকের মতে, হিন্দুরা সম্ভবতঃ এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করেছিলেন—অন্ততঃপক্ষে ভাস্করাচার্য সম্পর্কে এ-কথা রাউস বল-এর মত অনেক ভারত-বিদ্বেষী পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন।

সুদ, বিনিময়, মিশ্রণ, অংশীদারী প্রভৃতি বিভিন্ন পাটীগাণিতিক সমস্যা নিয়েও বেদোত্তর যুগের হিন্দুরা অনেক মূল্যবান চিন্তা ও গবেষণা করেছেন। এ-জাতীয় সমস্যার সমাধানে তাঁরা কখনও কখনও বীজগাণিতিক পদ্ধতিও প্রয়োগ করতেন।

পাটীগণিত অপেক্ষা বেদোত্তর ভারতীয় মনীষার অধিকতর গৌরবজনক বিকাশ হয়েছিল গণিতশাস্ত্রের বীজগণিত শাখাটিতে। এ-প্রসঙ্গে ভারতের কৃতিত্বের সম্যক্ পরিচয় পেতে হলে কিছুটা বৈষয়িক জ্ঞান বা technical knowledge থাকা দরকার। কিন্তু কতকটা ধারণা শুধুমাত্র এই ঘটনা থেকেই করা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বীজগণিতে ভারতীয় অবদান নিঃসন্দেহে অন্য যে কোন দেশের অবদানের চেয়ে বেশী; আর ব্যক্তিগত বিচারে একমাত্র ডায়োফ্যাণ্টাস্ (Diophantus) ছাড়া আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীধর ও ভাস্করের সমকক্ষ বীজগণিতজ্ঞ ঐ সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীতে আর কেউ ছিলেন না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিশ্ববিশ্রুত বীজগণিতজ্ঞ ডায়োফ্যাণ্টাস্ ছিলেন খৃষ্টীয় তৃতীয়—মতান্তরে চতুর্থ—শতকের গ্রীক-ঔপনিবেশিক সহর আলেক-জাণ্ড্রিয়ার অধিবাসী। রাউস বল-এর মতে, ইনি জাতিতে সম্ভবতঃ গ্রীক ছিলেন না। বীজগণিতে ডায়োফ্যাণ্টাসের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এঁর রচিত 'এরিথমেটিকা' (Arithmetica) গ্রন্থটিকে বীজগণিত সম্বন্ধে সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা হয়। কিন্তু, ডায়োফ্যাণ্টাসের পূর্ববর্তী কালের গ্রীক বীজগণিত, অনেক সদয় ও সহানুভূতিশীল

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের বিচারেও ছিল, "...whether we look at the form or the substance, unimportant or even childish and are not in any way the commencement of a science."—অর্থাৎ, "...কাঠামো বা বিষয়বস্তু যে-দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা যাক না কেন, গুরুত্বহীন বা এমনকি শিশুসুলভ এবং তাকে কোনমতেই বিজ্ঞানের সূচনা বলে গ্রহণ করা যায় না।" আর, ডায়োফ্যাণ্টাসের পরেও অনেকদিন পর্যন্ত ইউরোপীয় গাণিতিকেরা বীজগণিতের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেননি; ডায়োফ্যাণ্টাস্ ইউরোপে তাঁর যোগ্য সমাদর পান ষোড়শ শতাব্দীতে।

বেদোত্তর ভারতবর্ষে বীজগণিত চর্চার অন্যতম প্রধান প্রেরণা ছিল জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যাবলী। বেদোত্তর যুগের প্রায় সকল জ্যোতিষ-গ্রন্থ-প্রণেতাই তাঁদের রচনায় বীজগণিত সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। আর, সে-গবেষণা থেকে সে-যুগে ভারতবর্ষে যে-বীজগণিত জন্মলাভ করে তাই হ'ল আজকের দিনের বীজগণিতের গোড়ার অংশ। পঞ্চম শতকের হিন্দু বীজগণিতকার আর্যভট সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ফ্রীবেরী লিখেছেন: "This man is sometimes said to have begun algebra as we know it at school, though it is quite possible that he had seen some of the work of Diophantus."—অর্থাৎ, "এঁর সম্বন্ধে কথিত আছে যে, আমরা আজকাল বিদ্যালয়ে যে

বীজগণিত শিখে থাকি তার জন্ম হয়েছে এঁরই হাতে। অবশ্য এমন হওয়াও সম্ভব যে ডায়োফ্যাণ্টাসের কিছু কিছু কাজের সঙ্গে এঁর পূর্ব পরিচয় ছিল।”

প্রাচীন ভারতে ‘বীজগণিত’ শব্দটির সমার্থক হিসাবে আরও কতকগুলি শব্দের প্রচলন ছিল। বীজগণিত নামটি প্রথম ব্যবহার করেন পৃথূদকস্বামী। ব্রহ্মগুপ্তর দেওয়া নাম ছিল ‘কুট্টক গণিত’ বা ‘কুট্টক’। এ-নামকরণের প্রেরণা ছিল ‘কুট্টন’ শব্দটি, যার অর্থ চূর্ণন বা বিশ্লেষণ। অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ নাম ছিল ‘অব্যক্ত গণিত’। এ-নাম বিষয়টি সম্পর্কে হিন্দুদের স্বচ্ছ ও সম্যক ধারণার পরিচায়ক। কারণ, সঠিক মান জানা নেই এমন সংখ্যা নিয়ে কাজ করাই গণিতশাখা হিসাবে বীজগণিতের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অজ্ঞাতমান সংখ্যা বোঝাতে বেদোত্তর হিন্দুরা ‘অব্যক্ত’ ছাড়া ‘যাবৎ-তাবৎ’, ‘যদৃচ্ছ’, ‘বাঞ্ছা’ ও ‘কামিক’ শব্দগুলিও ব্যবহার করতেন। আর, সমীকরণে ব্যবহৃত জ্ঞাতমান সংখ্যা বা coefficient-এর নাম ছিল ‘গুণক’, ‘গুণকার’, ‘রূপ’, ‘দৃশ্য’ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ।

অব্যক্তের প্রতীক হিসাবে আধুনিক বীজগাণিতিক যেমন x, y প্রভৃতি বর্ণমালার অক্ষরগুলি ব্যবহার করেন, সে-যুগের হিন্দুরা অনুরূপ ভাবে ব্যবহার করতেন ‘যা’, ‘কা’, ‘নী’ প্রভৃতি যুক্তাক্ষর। ‘যা’ প্রতীকটি যাবৎ-তাবৎ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। আর ‘কা’, ‘নী’ প্রভৃতি প্রতীকগুলি ‘কালক’, ‘নীলক’ প্রভৃতি বিভিন্ন রংবাচক শব্দের আদ্যক্ষর—যে-রংগুলিকে প্রায়শই

বিভিন্ন অব্যক্তের দ্যোতক হিসাবে কল্পনা করা হ'ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ডায়োফ্যান্টাসের অজ্ঞাত সংখ্যাবোধক প্রতীক ছিল একটি; রাউস বল-এর ভাষায়, "...he could never use more than one unknown at a time."—অর্থাৎ, "...তিনি কখনও একই সঙ্গে একাধিক অজ্ঞাত সংখ্যা ব্যবহার করতে পারতেন না।"

হিন্দু বীজগণিতের প্রধান আলোচ্য বিষয় সমীকরণ-সমাধান। বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন মাত্রা বা degree-র একক- ও সহ-সমীকরণ সমাধানের ব্যাপারে হিন্দুরা আশ্চর্য দক্ষতা ও উদ্ভাবন-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বৈদিক হিন্দুরা সমীকরণ-সমাধানে অনেক সময়ে সুবিধা মত 'ক্ষেত্রগত' বা জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কিন্তু আর্যভট ও তাঁর পরবর্তী বীজগাণিতিকেরা সর্বত্র 'রাশিগত' অর্থাৎ বিশুদ্ধ বীজগণিতপদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

আর্যভটের 'আর্যভটীয়', মহাবীরের 'গণিতসার সংগ্রহ', ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' এবং অজ্ঞাতনামা কোন বীজগণিতজ্ঞের রচনা তথাকথিত 'বখ্‌শালী পাণ্ডুলিপি'-তে গঠিত, আলোচিত এবং সমাধান-কৃত কতকগুলি সমীকরণ আধুনিক লিখন পদ্ধতিতে হবে এই রকম:

সমীকরণ-প্রকৃতি	সমীকরণ	গণিত-গ্রন্থ
এক অব্যক্তের এক মাত্রার সমীকরণ	$ax+c=bx+d$	আর্যভটীয়
	$\frac{5x-\frac{5x}{3}}{10}+\frac{x}{3}+\frac{x}{2}+\frac{x}{4}=70-2$	লীলাবতী
	$6x+300=10x-100$	বীজগণিত
	$x+2x+6x+24x=132$	বখ্‌শালী পাণ্ডুলিপি
এক অব্যক্তের দুই মাত্রার সমীকরণ	$\frac{1}{4}x+2\sqrt{x}+15=x$	গণিতসার সংগ্রহ
	$\frac{x}{16}\times\frac{x}{16}+\frac{15x}{16\times9}\times\frac{15x}{16\times9}+14=x$	গণিতসার সংগ্রহ
	$\frac{1}{64}x^2+12=x$	বীজগণিত
এক অব্যক্তের তিন ও চার মাত্রার সমীকরণ	$x^3+12x=6x^2+35$	বীজগণিত
	$9\sqrt{\frac{2x}{3}}+6\sqrt{\frac{3}{5}\left(x-9\sqrt{\frac{2x}{3}}\right)}+24=x$	গণিতসার সংগ্রহ
	$x^4-2x^2-400x=9999$	বীজগণিত

সমীকরণ-প্রকৃতি	সমীকরণ	গণিতগ্রন্থ
দুই বা ততোধিক অব্যক্তের এক বা ততোধিক মাত্রার সহ-সমীকরণ	$9x+7y=107$ $7x+9y=101$ $x-\frac{3}{4}y=12$ $y-\frac{2}{3}x=12$	গণিতসার-সংগ্রহ
	$x+100=2(y-100)$ $y+10=6(x-10)$	বীজগণিত
	$x_1+x_2 = 16$ $x_2+x_3 = 17$ $x_3+x_4 = 18$ $x_4+x_5 = 19$ $x_5+x_1 = 20$	বখশালী পাণ্ডুলিপি
	$x-y = d$ $xy = b$ $x^2+y^2 = c$ $x+y = a$	আর্যভটীয়
	$x+y = a$ $xy = b$ $x^2+y^2 = c$ $xy = b$	গণিতসার-সংগ্রহ

উল্লিখিত সমীকরণগুলি জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে গঠিত সমস্যার সমাধান কল্পে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সমস্যা কোথাও ফলক্রেতার, কোথাও শুল্ক আদায়কারী রাজকর্মচারীর, কোথাও বা অংশীদারদের— ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্নে। অনেকগুলি সমীকরণের দুই বা ততোধিক পদ্ধতিতে সমাধান করা হয়েছিল।

খ্যাতনামা বীজগণিতজ্ঞ শ্রীধরাচার্য যে-কোন দুই মাত্রার সমীকরণ সমাধানের একটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন। নিয়মটি এই :

"চতুরাহত বর্গসমৈ রূপৈঃ পক্ষদ্বয়ং গুণয়েৎ।
অব্যক্ত বর্গরূপৈর্যুক্তৌ পক্ষৌ ততো মূলম্ ॥"

—অর্থাৎ, "প্রথমে অব্যক্তের বর্গের গুণকের চতুর্গুণ দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করা কর্তব্য; পরবর্তী কর্তব্য উভয় পক্ষে অব্যক্তের গুণকের বর্গের যোগ আর অতঃপর উভয় পক্ষের বর্গমূল নির্ণয়।" নিয়মের সূত্রটি খুবই সংক্ষিপ্ত—উল্লিখিত তিনটি ধাপের মধ্যে ও পরে আরো দুইটি ধাপ আছে, সূত্রে যার উল্লেখ নেই। ধাপগুলি অবশ্য সহজেই অনুমেয়। শ্রীধরাচার্যের পদ্ধতিতে $ax^2+bx+c=0$ সমীকরণটির সমাধান করতে হ'লে, প্রয়োজনীয় ধাপগুলি হবে এইরকম :

প্রথম ধাপ : $4a^2x^2+4abx+4ac=0$

দ্বিতীয় ধাপ : $(2ax+b)^2+4ac=b^2$

অনুল্লিখিত তৃতীয় ধাপ : $(2ax+b)^2=b^2-4ac$

চতুর্থ ধাপ : $2ax+b=\pm\sqrt{b^2-4ac}$

অনুল্লিখিত পঞ্চম ধাপ : $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

দুই মাত্রার সমীকরণের দু'টি সমাধানের কথা শ্রীধরাচার্যের জানা ছিল কি—তিনি কি বর্গমূলের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দু'টি মূল্যই গ্রহণ করেছিলেন? নিশ্চিত ভাবে এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মহাবীর, পদ্মনাভ ও ভাস্করাচার্য সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে। মহাবীরকৃত গণিতসার সংগ্রহে একাধিক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, আর পদ্মনাভর রচনায়, ইঙ্গিত নয়, স্পষ্ট উল্লেখই আছে। পদ্মনাভর মূল রচনাটি অবশ্য কালগ্রাসে বিলুপ্ত হয়েছে, গণিত-ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়নি; কিন্তু প্রাসঙ্গিক অংশটি ভাস্করাচার্য তাঁর বীজগণিত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা ক'রে ভাস্করাচার্য এ-প্রসঙ্গে নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কখনও কখনও দু'টি সমাধানই কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়।

অনির্ণেয় বা indeterminate সমীকরণ সমাধানের মত সূক্ষ্ম ও দুরূহ বিষয়ে বেদোত্তর হিন্দুদের কৃতিত্ব অধিকতর বিস্ময়কর। এ-ক্ষেত্রে অব্যক্তের সংখ্যা অনুসারে পর্যাপ্ত সংখ্যক সমীকরণ না থাকাতে অনন্য বা unique সমাধান সম্ভব নয়, কিন্তু অনেক সময়ে সুকৌশলে বহু বা অসংখ্য সমাধান নির্ণয় করা যায়। আর, ব্যবহারিক জীবনে সে-সমাধানের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভাস্করাচার্যকৃত বীজগণিতের এই সমস্যাটি বিবেচনা করা যেতে পারে: "সমবিত্তবান দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের চুনী, নীলা ও মুক্তা আছে যথাক্রমে 5টি, 8টি ও 7টি; দ্বিতীয়জনের ঐ রত্নগুলি আছে যথাক্রমে 7টি, 9টি ও 6টি। প্রথমজনের নগদ আছে 90টি মুদ্রা, দ্বিতীয়জনের 62টি।

রত্নগুলির মূল্য কিরূপ ?” এক্ষেত্রে অনন্য সমাধান সম্ভবপর নয়—মুদ্রায় চুনী, নীলা ও মুক্তার মূল্য যথাক্রমে x, y ও z দ্বারা সূচিত করলে পাওয়া যায় একটি অনির্ণেয় সমীকরণ :

$$5x+8y+7z+90=7x+9y+6z+62,$$

কিন্তু সম্ভাব্য অনেক সমাধান নির্ণয় করা যায়। ভাস্করাচার্যের মত পার্শ্বপরিবর্তন করলে এক্ষেত্রে পাওয়া যায়

$$x=\frac{-y+z+28}{2},$$

আর $z=1$ গ্রহণ করলে

$$x=\frac{-y+29}{2};$$

অতএব, $(x=14-m,\ y=2m+1,\ z=1)$ থেকে অসংখ্য পূর্ণসংখ্যার সম্ভাব্য সমাধান পাওয়া যাবে —m-এর মান ক্রমান্বয়ে 0, 1, 2, 3,…গ্রহণ করলে। আবার z-এর মান অন্যভাবে নির্দিষ্ট করলে অন্য সমাধানের সমষ্টিও আবিষ্কৃত হবে।

হিন্দু বীজগণিতজ্ঞদের দ্বারা বিবেচিত আরো কয়েকটি দুই বা ততোধিক অব্যক্তের এক বা একাধিক মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণের দৃষ্টান্ত :

সমীকরণ	বীজগণিতজ্ঞ
$\frac{ax\pm c}{b}=y$	মহাবীর
$197x-1644y-z=6302$	ব্রহ্মগুপ্ত
$8x+5=9y+4=7z+1=N$	১ম ভাস্কর (‘লঘু ভাস্করীয়’ ও ‘মহভাস্করীয়’ প্রণেতা)

সমীকরণ	বীজগণিতজ্ঞ
$11x^2+1 = y^2$ $6x^2+2x=y^2$ $3x^2+6x=y^2+2y$	ভাস্করাচার্য বা ২য় ভাস্কর ('লীলাবতী', 'বীজগণিত' প্রভৃতি প্রণেতা)

হিন্দুরা সে-যুগে অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানকে এত গুরুত্ব দিতেন যে 'দেবরাজ' নামে এক গণিতজ্ঞ 'কুট্টাকার-শিরোমণি' নামে শুধু ঐ বিষয়েই একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে অবশ্য তারও আগে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেই আর্যভট $by-ax=c$ এই অনির্ণেয় সমীকরণটির পূর্ণসংখ্যায় সমাধানের একটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে অনির্ণেয় সমীকরণ সম্বন্ধে ডায়োফ্যাণ্টাস-ও কিছু চিন্তা ও আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সুবিখ্যাত গণিত-ঐতিহাসিক ক্যাজোরি (Cajori)-র ভাষায়, "...the glory of having invented general methods in this most subtle branch of mathematics belongs to the Indians."—অর্থাৎ, "...এই অত্যন্ত সূক্ষ্ম কলাকৌশল-সিদ্ধ গণিত শাখাটিতে নির্বিশেষ সাধারণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের গৌরব ভারতীয়দের প্রাপ্য।"

বেদোত্তর বীজগণিতের গোড়ার দিকে—আর্যভট প্রভৃতির রচনায়—প্রগতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দেখা যায়। বিষয়টিকে অবশ্য হিন্দুরা বৈদিক যুগেই মোটামুটি ভাবে আয়ত্ব করেছিলেন—বেদোত্তর যুগে শুধুমাত্র প্রগতির যোগফল

নির্ণয়ের কয়েকটি সরল, সাধারণ সূত্র আবিষ্কৃত বা লিপিবদ্ধ করা হয়।

পাটীগণিত ও বীজগণিতের তুলনায় জ্যামিতির ক্ষেত্রে বেদোত্তর যুগের ভারতীয়রা কিছুটা পশ্চাৎবর্তী ছিলেন। বিষয়টিকে সম্ভবতঃ তাঁরা প্রাপ্য সমধিক গুরুত্ব দেননি। মুখ্যতঃ জ্যামিতি নিয়ে এই যুগে কোন গ্রন্থই রচিত হয় নি। ক্ষেত্রফল, ঘনফল ইত্যাদি নির্ণয়পদ্ধতি অর্থাৎ mensuration-এর কতকগুলি মুল্যবান সূত্র এবং বিশুদ্ধ জ্যামিতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা তাঁরা আবিষ্কার করেন, কিন্তু সমকালীন গ্রীক গণিতজ্ঞদের মত সুসংবদ্ধ জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় তাঁদের রচনায় বিশেষ পাওয়া যায় না। কতকগুলি একান্ত ভ্রান্ত সূত্রও তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন। বৈদিক যুগের জ্যামিতিক বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রমুখ শুল্বকারদের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে বেদোত্তর যুগের মাত্র একজন গণিতজ্ঞেরই নাম করা যায়। ইনি ব্রহ্মগুপ্ত।

আর্যভটপ্রস্তাবিত ঘন-নির্ণয়ের একাধিক সূত্র অত্যন্ত স্থূল অর্থাৎ approximate অথবা ভ্রান্ত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি 'পাই' (π) সংখ্যাটির যে-মান নির্ণয় করেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। মানটি $\frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$ বা ৩·১৪১৬।

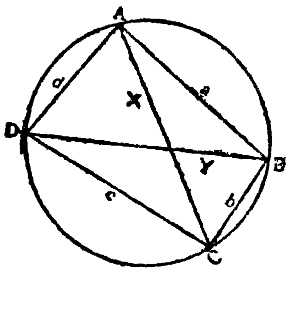
আর্যভটের ভুল সূত্রগুলিকে সংশোধন করেন ব্রহ্মগুপ্ত। ইনি আরো অনেকগুলি নতুন সঠিক সূত্রও আবিষ্কার করেন। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল-সূচক সুপরিচিত $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ রাশিটি ব্রহ্মগুপ্তর রচনায় পাওয়া যায়। আর, বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের

ক্ষেত্রফল S এবং কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য X, Y সম্পর্কে তাঁর সূত্র ছিল :

$$S=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)},$$

$$X=\sqrt{\frac{(ac+bd)(ad+bc)}{ab+cd}},$$

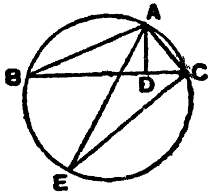
এবং $$Y=\sqrt{\frac{(ac+bd)(ab+cd)}{ad+bc}},$$



AB, BC প্রভৃতি বাহুগুলির দৈর্ঘ্য জানা থাকলে ব্রহ্মগুপ্তের সূত্রের সাহায্যে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-র ক্ষেত্রফল এবং AC ও BD কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায়

যেখানে a, b, c, d যে-কোন একটি ক্রম অনুযায়ী চতুর্ভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্য এবং $2s=a+b+c+d$। বৃত্তস্থ ক্ষেত্রে বা figure সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্তর আরও কতকগুলি মূল্যবান গবেষণা

ছিল। প্রাসঙ্গিক একটি উপপাদ্য বর্তমান কালেও 'ব্রহ্মগুপ্তের উপপাদ্য' নামে সুপরিচিত। উপপাদ্যটি এই—

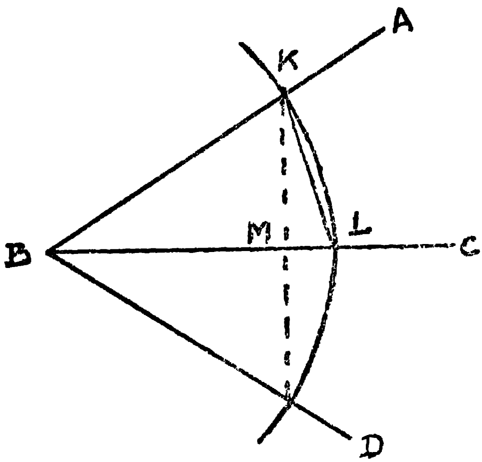


AD রেখা ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু A থেকে ভূমি BC-র উপর অঙ্কিত লম্ব এবং AE রেখা ত্রিভুজটির পরিবৃত্তের A বিন্দুগামী ব্যাস হ'লে, ব্রহ্মগুপ্তর উপপাদ্য অনুসারে, AB.AC = AE.AD

কোন ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হইতে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্ব এবং ত্রিভুজের পরিবৃত্ত বা circum-circle-এর ব্যাসের অন্তর্গত আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজের দুই বাহুর অন্তর্গত আয়তক্ষেত্রটির সমান। ব্রহ্মগুপ্ত তথাকথিত 'পিথাগোরাসের উপপাদ্য'টিও প্রমাণ করেন।

ব্রহ্মগুপ্তর পর ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজ, বৃত্ত ও ঘনবস্তু বা solid figure সম্পর্কে উচ্চশ্রেণীর আলোচনা ও কিছু কিছু মূল্যবান সংযোজনা করেন মহাবীর ও ভাস্করাচার্য। ভাস্কর 'পাই' (π)-এর মূল্য নিরূপণের অনেকগুলি পদ্ধতি দেন। একার্যে একস্থানে তিনি বৃত্তমধ্যে ৩৮৪ বাহুর একটি সুষম বহুভুজ ব্যবহার করেন। মহাবীর কনিকস্ (Conics) সম্পর্কেও যৎসামান্য আলোচনা করেন।

বিশুদ্ধ জ্যামিতির চেয়ে ত্রিকোণমিতিতে বেদোত্তর হিন্দুদের অগ্রগতি ও অবদান বেশী প্রশংসনীয়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের গ্রীক গাণিতিক হিপার্কাস (Hipparchus)-কে ত্রিকোণমিতির জনক বলা হয়ত অসংগত নয়, কিন্তু এই গণিতশাখাটির অনেকগুলি মূল ধারণা ও পদ্ধতির প্রথম উদ্ভাবক হিন্দুরা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাইন কোণানুপাতের কথা বলা যায়। এই মূল কোনানুপাতটির স্থলে গ্রীকরা কোণের chord বা জ্যা-র



KL রেখা ABC কোণের একটি জ্যা, KM দ্বিগুণ কোণের অর্ধ-জ্যা ; BK একক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হ'লে $\frac{KM}{BK} = KM$ হয় অর্থাৎ আধুনিক সংজ্ঞার সাইন হিন্দু সংজ্ঞার সাইনে পরিণত হয়

ব্যবহার করতেন, পক্ষান্তরে হিন্দুরা গ্রহণ করেছিলেন দ্বিগুণ কোণের অর্ধ-জ্যাকে ; আর, এই শেষোক্ত রাশিটিই আধুনিক

সাইনের খুব নিকটবর্তী, প্রায় তুল্যমূল্য। একজন পাশ্চাত্য গণিতের ভক্ত ঐতিহাসিক লিখেছেন : "The change from the chord of an arc to the semi-chord may appear to be simple, but the first conception of this change did not come easily as will be realized by the fact that it did not occur to the Greek mind."—অর্থাৎ, "কোণের জ্যা-র পরিবর্তে অর্ধ-জ্যাকে গ্রহণ আপাতবিচারে হয়ত খুব সহজ সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হ'তে পারে, কিন্তু আসলে যে এর ধারণা সহজে আসেনি তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে যে, গ্রীক মানসে এটি উদিত হয়নি।"

'সাইন', 'কো-সাইন' কোণানুপাতের এই নাম দু'টির উৎপত্তিও সংস্কৃত ভাষায়। সাইনের আদিরূপ সংস্কৃত 'জ্যা' বা 'জীবা' শব্দ। আরবী অনুবাদকদের হাতে এর রূপ দাঁড়ায় 'জীব'। জীব শব্দটি সম্পূর্ণ নতুন হ'লেও অনুরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট আর একটি শব্দ আরবী ভাষায় সুপ্রচলিত ছিল, যার অর্থ ছিল—'বক্ষদেশ', 'বক্ররেখা' প্রভৃতি। ল্যাটিন sinus শব্দটির অর্থও তাই এবং সেই সূত্রেই দ্বাদশ শতাব্দীতে ঘেরার্ডো অফ ক্রেমোনা (Gherardo of Cremona) নামে পরিচিত জনৈক ইউরোপীয় গণিতজ্ঞ-কৃত আরবী গণিত গ্রন্থগুলির ল্যাটিন অনুবাদে sinus শব্দের ব্যবহার। আর sinus থেকেই বর্তমান sine। সংস্কৃত 'কোটি-জ্যা' বা সংক্ষেপে 'কো-জ্যা'-ও অনুরূপভাব বর্তমান cosine-এর পূর্বরূপ।

'জ্যা' ও 'কোটি-জ্যা'র সঙ্গে আরো দু'টী কোণানুপাত প্রাচীন ভারতীয় ত্রিকোণমিতিতে বহু প্রচলিত ছিল—'উৎক্রম জ্যা' ও 'কোটি-উৎক্রম জ্যা'। আধুনিক ত্রিকোণমিতিতে স্বল্প ব্যবহৃত এই কোণানুপাতগুলির নাম যথাক্রমে versed sine বা vers এবং coversed sine বা covers ; এগুলি যথাক্রমে 1 – cos ও 1 – sin-এর সমান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন গ্রীক গণিতে chord বা জ্যা ছাড়া আধুনিক সাইনের অনুরূপ কোন রাশির ব্যবহার বা উল্লেখ না থাকলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত কয়েকজন ইউরোপীয় লেখক এ-সম্পর্কে গ্রীসেরই অগ্রাধিকার দাবী করতেন। এই সত্যসন্ধানী পণ্ডিত-প্রবরদের মধ্যে পি. ট্যানারী (P. Tannery) অন্যতম। এঁর মতে, গ্রীসে সাইনানুপাত প্রচলিত ছিল—যদিও হিপার্কাস প্রমুখ গণিতবিদ্‌রা তার ব্যবহার না করে chord-এরই তালিকা লিপিবদ্ধ করেন! এ-মতের প্রতিবাদ অবশ্য অন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই করেছেন। একজন মন্তব্য করেছেন, ট্যানারীর দল বিশ্বাস করতে পারেন না যে ভারতবর্ষে গণিতশাস্ত্রের বড় কিছু আবিষ্কার হতে পারে ; ভারতবর্ষে 'সাইন' ব্যবহৃত হ'ত সুতরাং গ্রীস থেকেই ভারতবাসীরা তা পেয়েছেন এটা তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ।

মহাপণ্ডিত আর্যভট তাঁর 'আর্যভটীয়' গ্রন্থে ৩$\frac{3}{4}$° ব্যবধানে গৃহীত অনেকগুলি ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণের সাইনানুপাত নির্ণয় করেন। পরবর্তী অনেক গাণিতিকের রচনায় আর্যভটের তালিকাটি পুনর্লিখিত হয়। বরাহমিহির তাঁর 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য়

অপর এক কোণসমষ্টির সাইনানুপাত লিপিবদ্ধ করেন। আর্যভট তাঁর পদ্ধতিতে যে সূত্রটির ব্যবহার করেন 'সূর্যসিদ্ধান্ত'য় এবং আর্যভট-পরবর্তী অনেক জ্যোতিষগ্রন্থে তার ব্যবহার আছে। সূত্রটি আধুনিক ভাষায় এই :

$$\sin(n+1)A - \sin \ nA$$

$$= \sin nA - \sin(n-1)A - \sin nA \operatorname{cosec} A,$$

যেখানে $A = 3\frac{3}{4}^\circ = 225'$। সূত্রটিতে পরিপূর্ণ শুদ্ধতার বিচারে একটু ত্রুটি আছে। এর শেষ পদটিতে cosec A-র স্থলে $4\sin^2 A$ থাকা উচিত। কিন্তু আর্যভট ছোট কোণ ও তার সাইনানুপাতের মাপ প্রায় সমান কল্পনা ক'রে sin A-র মান গ্রহণ করেন 225 অর্থাৎ A-র মিনিটের পরিমাপ; আর শুদ্ধতার আর্যভট নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সূত্রটি কার্যকরী। ফরাসী গণিত-ঐতিহাসিক ড্যলাম্বার (Delambre) আর্যভট ব্যবহৃত পদ্ধতির মূল-নীতি সম্পর্কে ১৮১৭ সালে লিখেছেন : "This differential process has not upto now been employed except by Briggs···. Here then is a method which the Hindus possessed but which is found neither amongst the Greeks nor amongst the Arabs."—অর্থাৎ, "একমাত্র ব্রীগস ছাড়া এই অন্তরফল-ভিত্তিক পদ্ধতিটি এ-পর্যন্ত আর কেউ ব্যবহার করেননি···। দেখা যাচ্ছে যে, এ-পদ্ধতিটি হিন্দুদের আয়ত্বে ছিল কিন্তু গ্রীক বা আরবদের জানা ছিল না।"

বেদোত্তর হিন্দু গণিতজ্ঞদের বিভিন্ন রচনায় যে সমস্ত

ত্রিকোণমিতিক সূত্র পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কতগুলি আধুনিক সংকেতে এই :

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \sin B \cos A$$

$$\sin^2\frac{A}{2} = \frac{1 - \cos A}{2}$$

$$\sin^2 2A + \text{vers}^2 2A = 4\sin^2 A$$

$$\sin^2(45^\circ \pm A) = \frac{1 \pm \sin 2A}{2}$$

$$\sin\frac{A - B}{2} = \frac{1}{2}[(\sin A - \sin B)^2 + (\cos A - \cos B)^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

সে যুগের হিন্দুরা গোলক-ত্রিকোণমিতি বা Spherical Trigonometry-র কিছু কিছু চর্চাও করেছিলেন। এই সূত্রগুলির উল্লেখ ও ব্যবহার বিভিন্ন জ্যোতিষীর গ্রন্থে পাওয়া যায় :

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$$

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$$

$$\cos A \sin c = \cos a \sin b - \sin a \cos b \cos C$$

বেদোত্তর হিন্দু গণিতজ্ঞদের মধ্যে কারুর কারুর রচনায় ব্যাস ও সমাস গণিত বা Differential and Integral Calculus-এর বীজ নিহিত ছিল, কোন কোন প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ-মত ব্যক্ত করেছেন। প্রধানতঃ মঞ্জুল এবং ভাস্করাচার্যের রচনা বিশ্লেষণ করেই এ-কথা বলা হয়। কেউ কেউ দশম শতকের গাণিতিক দ্বিতীয় আর্যভটের নামও করেন। মঞ্জুল তাঁর 'লঘুমানস'-এ $u = v \pm e \sin A$ এরূপ অপেক্ষক বা function-র সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বৃদ্ধি প্রকাশ করেছেন $du = dv \pm e(\cos A)dA$-র অনুরূপ একটি সম্পর্ক দ্বারা। আর, ভাস্করাচার্যর রচনা সম্পর্কে রাউস বল, যাঁকে কোনক্রমেই ভারতপ্রেমিক বলা যায় না, লিখেছেন: "Amongst the trigonometrical formulae is one which is equivalent to the equation $d(\sin \theta) = \cos\theta \, d\theta$."—অর্থাৎ, "ত্রিকোণমিতিক সূত্রগুলির মধ্যে একটি সূত্র আছে যা $d(\sin \theta) = \cos \theta \, d \theta$ সূত্রটির অনুরূপ।"

কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত ভাস্কর সম্পর্কে আরও বেশী কৃতিত্ব দাবী করেছেন। মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদীর মতে 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে দু'টি উক্তি আছে যার প্রকৃত অর্থ এই:

(১) কোন অপেক্ষক চরম মান গ্রহণ করলে, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৃদ্ধি অন্তর্হিত হয়—অর্থাৎ, When a function attains a maximum value its differential vanishes.

(২) কোন অপেক্ষক দুই স্থানে অন্তর্হিত হ'লে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৃদ্ধি মধ্যবর্তী কোন স্থানে অন্তর্হিত হয়—অর্থাৎ, If a function vanishes at 2 points, then at some intermediate point the differential vanishes. এ-প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য এই যে, উল্লিখিত উক্তি দু'টি আধুনিক

ব্যাস গণিতের যথাক্রমে চরম মানের প্রয়োজনীয় শর্ত বা necessary condition for extremum এবং রোলের উপপাদ্য বা Rolle's Theorem-এর অমার্জিত রূপ। ভাস্কর যে ব্যাস গণিতের মূলতত্ত্ব হৃদয়ংগম করেছিলেন, একথা অন্য ভাবে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন বাপুদেব শাস্ত্রী। তিনি দেখিয়েছেন যে ভাস্কর-কল্পিত গ্রহের 'তাৎকালিকী গতি' বা instantaneous motion এবং এই গতিনির্ণয়ের ভাস্করপ্রদত্ত পদ্ধতির মধ্যে ব্যাস গণিতের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। কোন গ্রহের পর পর দুইদিনের একই সময়ের অবস্থান-তারতম্য লক্ষ্য ক'রে নির্ণীত তার গতিবেগের যে-ধারণা ভাস্করের পূর্বে প্রচলিত ছিল ভাস্কর তাকে 'স্থূল-গতি' আখ্যা দেন এবং 'সূক্ষ্ম-গতি' বা 'তাৎকালিকী গতি'-র ক্ষেত্রে 'ত্রুটি' বা প্রায় $\frac{১}{৩৪,০০০}$ সেকেণ্ড কাল গ্রহণের নির্দেশ দেন। ইংরেজ জ্যোতিবিজ্ঞানী স্পটিশউড (Spottiswoode) ভাস্করের এই চিন্তা ও পদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "...It must be admitted that the penetration shewn by Baskara in his his analysis is in the highest degree remarkable; that the formula which he establishes and his method of establishing it, bear more than a resemblance—they bear a strong analogy to the corresponding process in modern mathematical astronomy; and that the majority of scientific persons will learn with surprise the existence of

such a method in the writings of so distant a period and so remote a region."—অর্থাৎ, "...এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভাস্কর তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে যে গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতি মাত্রায় চিত্তাকর্ষক ; তিনি যে-সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যে ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার সঙ্গে আধুনিক গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুধু সাদৃশ্য নয়, অনেকটা মিল আছে ; আর বৈজ্ঞানিক সমাজের অনেকেই সুদূর অতীতে, সুদূর এক অঞ্চলে এমন একটি পদ্ধতির প্রচলনের কথা জানলে খুব বিস্মিত হবেন।" কিন্তু, ভাস্করের পদ্ধতি যে ব্যাস গণিতের পদ্ধতি থেকে অভিন্ন বাপুদেব শাস্ত্রীর সে-দাবী স্বীকার না করে স্পটিশউড বলেছেন যে, ভাস্কর "makes no allusion to one of the most essential features of the Differential Calculus viz., the infinitesimal magnitude of the intervals of time and space therein employed. Nor indeed is anything specifically said about the fact the method is an approximate one." —অর্থাৎ, "ব্যাস গণিতের পক্ষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি—সে বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত স্থান ও কালের পরিমাণের শূন্য-অভিসারিতা। এমনকি এ-কথাও স্পষ্ট করে বলা নেই যে, ব্যবহৃত পদ্ধতির ফল আসন্ন-মান।" স্পটিশউড-এর এ-আপত্তিই অবশ্য শেষ কথা নয়। এর প্রতিবাদ হয়েছে, করেছেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনি তাঁর 'দি পজিটিভ্ সায়ান্সেস

অফ দি এনশিয়েণ্ট হিন্দুস' গ্রন্থে 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'-র গ্রহ-গণিতাধ্যায়ের একটি অংশের ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, 'ত্রুটি'র সাহায্যে নির্ণীত গতিকেও ভাস্কর স্থূলগতি মনে করতেন, তাৎকালিকী গতি আসলে এক একটি মুহূর্ত বা 'প্রতিক্ষণম'-এর সঙ্গে যুক্ত।

গোলক অর্থাৎ sphere-এর ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নির্ণয়ে ভাস্কর গোলককে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। পদ্ধতিটিকে এক অর্থে সমাকলন বা integration-এর আদিম রূপ বলা যেতে পারে।

গণিতশাস্ত্রের জ্যোতির্বিজ্ঞান শাখাটিতে বেদোত্তরযুগের হিন্দুদের অবদান বিশেষ প্রশংসনীয়। অধিকতর প্রশংসনীয় এ-বিষয়ে তাঁদের গবেষণার পরিধির ব্যাপকতা। এই বিজ্ঞানটি সেযুগের হিন্দুদের সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি ও মনোযোগ লাভ করেছিল। প্রধান প্রধান গণিত-বিজ্ঞানীরা প্রায় সবাই এই বিজ্ঞানটির অল্পবিস্তর চর্চা করেছিলেন। এই সময়ে কৃত অধিকাংশ বিশুদ্ধ গাণিতিক আবিষ্ক্রিয়ার মূল প্রেরণাও ছিল জ্যোতির্বিদ্যা।

জ্যোতিষের দৃষ্টি-কোণ থেকে পূর্ববর্তী বৈদিক যুগের সঙ্গে বেদোত্তর যুগের কোনও তুলনাই হয় না। গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বের অনুমানমূলক কল্পনা-মিশ্রিত অগভীর জ্ঞানের পরিবর্তে, বেদোত্তর যুগে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও শুদ্ধ গণনার উপর জ্যোতিষের প্রতিষ্ঠা। বেদোত্তর যুগের সূচনাতে অবশ্য 'সূর্য প্রজ্ঞপ্তি,' 'চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি' ও 'ভদ্রবাহবীয় সংহিতা' নামে তিনটি জ্যোতিষগ্রন্থ রচিত হয়, যেগুলি

এমন কি বৈদিক যুগের জ্যোতিষগ্রন্থের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর। কিন্তু খৃষ্টোত্তর প্রথম কয়েক-শতকের মধ্যে প্রণীত 'সিদ্ধান্ত' গ্রন্থগুলি অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে। আর খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে পরপর আর্যভট, লাটদেব, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মঞ্জুল, ভাস্করাচার্য প্রভৃতির স্পর্শ লাভ ক'রে অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত থেকে উন্নততর হ'তে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে এ-কথা উল্লেখ্য যে সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের যুগে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পাশ্চাত্য দেশের কিছু কিছু জ্যোতিষীয় তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ ও তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে স্থাপিত কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশ দুই সভ্যতার মধ্যে ভাব ও পদ্ধতি বিনিময়ের পথ উন্মুক্ত করেছিল। এই পথেই সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ পাশ্চাত্য জ্যোতিষের কাছ থেকে কিছু মূল্যবান উপাদান লাভ করে। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতীয় জ্যোতিষে প্রাধান্য লাভ করেনি। পিতামহ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কতকগুলি সিদ্ধান্ত একরূপ পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত। আর রোমক, পৌলিশ, যবন প্রভৃতি যে সিদ্ধান্তগুলিতে এই প্রভাব সর্বাধিক, সেগুলিও সমসাময়িক পাশ্চাত্য জ্যোতিষগ্রন্থগুলি থেকে বিশিষ্ট—প্রকল্প ও পদ্ধতির ভারতীয় বৈশিষ্ট্য এই সিদ্ধান্তগুলিতেও বিদ্যমান। বস্তুতঃ, বিদেশী ভাবধারাকে নির্বিচারে পুরোপুরি গ্রহণ বা পুরোপুরি বর্জন কোনটাই না করে বেদোত্তর হিন্দুরা তাঁদের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় রেখে গেছেন।

সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলির মধ্যে সূর্যসিদ্ধান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্ভবতঃ সর্বপরবর্তী। এই গ্রন্থটির আবার বহু সংস্করণ হয়েছে—বহু জ্যোতির্বিদ ও টীকাকারের হাতে নানাভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে গ্রন্থটি বর্তমান রূপ পেয়েছে। আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নানা সময়ে এই সব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়। বেদোত্তর ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানের দোষগুণ বিচার করতে হলে মুখ্যতঃ বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটিকে বিচার করাই সংগত।

বেদোত্তর হিন্দুরা ৩৬৫.২৫৮ দিনকে বৎসর বলে গণ্য করতেন। ৪৩২০০০০ বৎসর বা ১৫৭৭৯১৭৮০০ দিন বা মতান্তরে ১৫৭৭৯১৭৮১৮ দিনকে তাঁরা এক 'মহাযুগ' আখ্যা দিতেন। মহাযুগের কল্পনার মধ্যে একটি প্রশংসনীয় দিক আছে। পৃথিবীর চারিদিকে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের আপাত গতিবেগ নির্দেশ করতে তাঁরা এক মহাযুগে জ্যোতিষ্কগুলি ক'বার পরিক্রমণ সম্পূর্ণ করে তার উল্লেখ করতেন। আর মহাযুগের দৈর্ঘ্য তাঁরা এমন সুকৌশলে নির্দেশ করেন যাতে অধিকাংশ জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রেই সংখ্যাটি এক একটি পূর্ণ সংখ্যা হয়। পৌলিশ-সিদ্ধান্তে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের 'ভগন-সংখ্যা' বা পরিক্রমণ-সংখ্যার একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট আছে। সামান্য পরিবর্তন করে সেই তালিকাটিই সূর্যসিদ্ধান্তে পুনর্লিখিত হয়। মহাযুগের দৈর্ঘ্যকে এই ভগন-সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে 'ভগন-কাল' বা পরিক্রমণ কাল পাওয়া যায়। পরিক্রমণকাল নির্ণয়ে কেবলমাত্র পৃথিবীকে গ্রহণ না করে পৃথিবী ও সূর্য

উভয়কেই গ্রহণ করলে যে কাল পাওয়া যায় তাকে হিন্দুরা 'যুতি-কাল' বলতেন। আধুনিক ইংরেজী পরিভাষায় 'ভগন-কাল' ও 'যুতি-কাল' হচ্ছে যথাক্রমে sidereal period ও synodic period।

সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলিতে গ্রহণ বা eclipse-এর সময় নিরূপণের একাধিক পদ্ধতি বর্ণিত আছে। বেদোত্তর হিন্দুরা পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয়ের পদ্ধতি জানতেন। সূর্যসিদ্ধান্তে ব্যাসের নির্ণীত মান দেওয়া আছে ১৬০০ যোজন। এক যোজনকে পাঁচ মাইলের সমান ধরলে মানটি শুদ্ধ, কিন্তু যোজন অবশ্য, অনেকের মতে, পাঁচ মাইলের সমার্থক ছিল না। হিন্দুরা আহ্নিক লম্বন বা diurnal parallax-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্যের রচনায় লম্বনের পরিমাণ নির্ণয়-পদ্ধতির বর্ণনা আছে। ব্রহ্মগুপ্ত চন্দ্রের সর্বাধিক লম্বন হিসাবে প্রায় ৫৩ মিনিটকে গ্রহণ করতেন। আধুনিক গণনায় চন্দ্রের এই সর্বাধিক লম্বন বা Horizontal parallax প্রায় ৫৭ মিনিট।

সূর্যের গতির জটিলতার জন্য আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে কাল-সমীকরণ বা equation of time নামে পরিচিত যে ধারণাটির ব্যবহার করা হয়, বেদোত্তর যুগের হিন্দুরা সে-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন—গতিবেগের বৈষম্য সম্বন্ধে সুপ্রাচীন কাল থেকে, আর গতিপথের বক্রতা বা obliquity সম্বন্ধে একাদশ শতাব্দী থেকে। দ্বিতীয়টি আবিষ্কারের কৃতিত্ব শ্রীপতির। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গ্রীস দেশে দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই

টলেমী (Ptolemy)-র কৃতিত্বে কাল-সমীকরণের দুটি অংশই আবিষ্কৃত হয়। এ-ঘটনা এবং অনুরূপ আরো কয়েকটি ঘটনা, অনেক পণ্ডিতের মতে, হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বুধ, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগুলি আসলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না, করে সূর্যকে। আর, সে-প্রদক্ষিণের পথ বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার বা elliptical। পৃথিবী থেকে তাদের তাই সমগতিবেগ মনে হয় না, তাদের গতিপথকেও সহজ, সরল মনে হয় না। বেদোত্তর ভারতীয়রা গ্রহগতির এই বিভিন্নতা লক্ষ্য করেন। সূর্যসিদ্ধান্তের মতে গ্রহদের গতি আট প্রকার—বক্র, অনুবক্র, কুটিল, মন্দ, মন্দতর, সম, অতিশীঘ্র ও শীঘ্র। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় উল্লিখিত প্রথম তিন প্রকার গতি retrograde, বাকীগুলি direct। গ্রহদের জটিল গতিপথ ব্যাখ্যা করতে হিন্দুরা উৎকেন্দ্রিক বৃত্ত অর্থাৎ eccentric circle ও অনুবৃত্ত অর্থাৎ epicycle-এর ব্যবহারও করতেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ-পদ্ধতি সম্ভবতঃ আর্যভটের সংযোজনা, আর আর্যভট খুব সম্ভব এ-ব্যাপারে পাশ্চাত্য চিন্তাধার কাছে ঋণী। কিন্তু আর্যভট পরিবৃত্ত-উৎকেন্দ্রিকবৃত্তে গ্রহদের গতির ব্যাপারটা নিছক গাণিতিক কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, গ্রীকদের মত সেটাকে বাস্তব সত্য বলে মনে করতেন না। বার্গেস্ লিখেছেন: "The Hindu theory, however,…rejects the idea of the actual motion of the planet in the epicycle, or on the

eccentric circle ; the method is but a device for ascertaining the effect of the attractive force…."
—অর্থাৎ, "হিন্দু তত্ত্বে কিন্তু…অনুবৃত্ত বা উৎকেন্দ্রিক বৃত্তে গ্রহের প্রকৃত কোন গতি নেই ; পদ্ধতিটি আসলে আকর্ষণী শক্তির ফলাফল নির্ণয়ের একটি উপায় মাত্র… ।"

প্রাপ্ত সূর্যসিদ্ধান্তে অয়ন-চলন বা precession of the equinoxes-এর আলোচনা ও ব্যবহার আছে। কিন্তু অনেক ভারত-বিজ্ঞানীর মতে মূল সূর্যসিদ্ধান্তে এটা অনুপস্থিত ছিল ; আর্যভট, এমন কি ব্রহ্মগুপ্ত পর্যন্ত, এই তথ্য বা তথ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ বিষ্ণুচন্দ্র এবং তাঁর অল্প পরবর্তী শ্রীষেন নিঃসন্দেহে অয়ন-চলনের তথ্য জানতেন। কিন্তু এর তাৎপর্য সম্যকভাবে প্রথম উপলব্ধি করেন মঞ্জুল। 'লঘু-মানস'-এ তিনি এ-বিষয়ে পর্যালোচনা করেন এবং অয়ন-গতিবেগও নির্ণয় করেন। মঞ্জুলের উত্তর-সাধক ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে ভাস্করাচার্য, অয়ন-চলনের ঘটনাকে সবিশেষ গুরুত্ব দেন। মঞ্জুল প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণ অয়ন-বেগের মান গ্রহণ করেন ৫৯˙৯ সেকেণ্ড, যার বর্তমানে গৃহীত মান প্রায় ৫০˙২৪ সেকেণ্ড। কিন্তু গণনার দিক থেকে নিকটবর্তী হলেও, ধারণার দিক থেকে এঁরা অনেক পরিমাণে ভ্রান্ত ছিলেন। মঞ্জুলের ধারণা ছিল যে অয়নের গতি দোলকের মত দিকপরিবর্তনশীল। ভাস্করাচার্য আধুনিক মতে অর্থাৎ বৃত্তাকার গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় গণিতবিদ্‌দের কাছে ভাস্করের মত বিশেষ সমর্থন লাভ করেনি।

হিন্দুরা সে-যুগে জ্যোতিষবিষয়ক পরীক্ষার জন্য 'শঙ্কু', 'ঘটি' প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। সূর্যসিদ্ধান্তর একটি পরিচ্ছেদে এই সব যন্ত্রপাতির আলোচনা আছে।

সূর্যসিদ্ধান্তে প্রদত্ত ভগন ও যুতি সংখ্যা থেকে গণনা করে যে ভগন- ও যুতি-কাল পাওয়া যায় আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুরূপ রাশিগুলির তুলনায় তা এই রকম :

জ্যোতিষ্ক	ভগন-কাল		যুতি-কাল	
	সূর্যসিদ্ধান্ত মতে দিনের হিসাবে	আধুনিক মতে দিনের হিসাবে	সূর্যসিদ্ধান্ত মতে দিনের হিসাবে	আধুনিক মতে দিনের হিসাবে
বুধ	৮৭·৯৬৯	৮৭·৯৬৯	১১৫·৮৭৬	১১৫·৮৭৭
শুক্র	২২৪·৬৯৭	২২৪·৭০০	৫৮৩·৮৯৭	৫৮৩·৯২০
পৃথিবী	৩৬৫·২৫৮	৩৬৫·২৫৬		
চন্দ্র	২৭·৩২১	২৭·৩২১	২৯·৫৩০	২৯·৫৩০
মঙ্গল	৬৮৬·৯৯৭	৬৮৬·৯৮০	৭৭৯·৯২১	৭৭৯·৯৩৬
বৃহস্পতি	৪৩৩২·৩২০	৪৩৩২·৫৮৫	৩৯৮·৮৮৯	৩৯৮·৮৬৭
শনি	১০৭৬৫·৭৭৩	০৭৫৯·২১০	৩৭৮·০৮৫	৩৭৮·০৯০

মাত্র কয়েকটি অত্যন্ত প্রাথমিক ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে বেদোত্তর ভারতে এতদূর সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ গণনা কি করে সম্ভব হয়েছিল, আজকের দিনে তা শুধু শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে কল্পনাই করা চলতে পারে।

পৃথিবীর চারিদিকে নক্ষত্রসমূহের আবর্তন একটি প্রত্যাভাস মাত্র, প্রকৃত ঘটনা পশ্চিম থেকে পূর্বে পৃথিবীর আহ্নিক গতি। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের এটি একটি মৌলিক, অত্যন্ত গুরুত্ব-

পূর্ণ সিদ্ধান্ত। বেদোত্তর ভারতে—খৃষ্টীয় পঞ্চমশতকে—আর্যভট এ-সত্য উপলব্ধি করেন এবং 'আর্যভটীয়' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে তা ঘোষণা করেন। আর্যভটের এই 'ভূ-ভ্রমণবাদ' অবশ্য ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বরাহমিহির, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, ভট্টোৎপল—এমন কি ভাস্করেরও এ-মতবাদ সম্পর্কে বিরোধিতা বা সংশয় ছিল। অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদীদের বক্তব্যগুলি বেশ কৌতুকজনক—তাঁদের কুশাগ্র বুদ্ধির পরিচায়কও বটে। বরাহমিহির 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় আপত্তি তোলেন যে, পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূবে ঘূর্ণ্যমান হলে পতাকা সকল সময়ে পশ্চিম দিকে উড্ডীন থাকত আর পাখীরা একবার আকাশে উড়তে আরম্ভ করে অল্পক্ষণ পরে আবার বাসায় ফিরতে পারত না ; পৃথিবীর গতি খুব অল্প বলেও এর ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না, কারণ এ-গতিতে একদিনে পৃথিবী একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে। 'বিহঙ্গের কুলায়-প্রাপ্তি'-র দৃষ্টান্তটি লল্লও ব্যবহার করেন, আর প্রশ্ন তোলেন—আকাশাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বাণ সবসময়ে পশ্চিমদিকে পতিত হয় না কেন, মেঘ কেবল পশ্চিমদিকেই ভেসে যায় না কেন? আর্যভটের মতবাদের কিছু সমর্থকও ছিলেন। সমর্থকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পৃথূদকস্বামী। এঁরা জ্যোতিষীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-ভ্রমণবাদকে সমর্থন করতেন। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলেরও আহ্নিকগতির কথা বলে উল্লিখিত আপত্তিগুলি এঁরা সার্থকভাবে খণ্ডন করেননি।

আর্যভট লেখেন :

"অনুলোমগতি নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্ ॥"

—অর্থাৎ, "স্রোতের অনুকূলগতিবিশিষ্ট নৌকারূঢ় ব্যক্তি তীরস্থ অচল বস্তুগুলিকে প্রতিকূলগামী দেখেন ; তেমনি নিরক্ষ অঞ্চলে অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিমগামী দেখা যায়।" ভারত-ভূমিতে এ শ্লোক রচিত হয়েছে পঞ্চম শতাব্দীতে—ইউরোপে কোপার্নিকাস-এর জন্মের প্রায় হাজার বৎসর আগে।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে আর্যভটের মতবাদের প্রতিধ্বনি করায়, হাজার বৎসর পরে ইউরোপে কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও-কে অশেষ লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছিল, এমন কি বিজ্ঞানচর্চাতেও বাধা এসেছিল। ভারতবর্ষে কিন্তু সে-রকম কিছু হয় নি। এটা নিঃসন্দেহে বেদোত্তর ভারতের বিজ্ঞান-ইতিহাসের প্রশংসনীয় দিক।

উপসংহার

বিজ্ঞান ঃ ইতিহাস

॥ বিজ্ঞান ॥

কোন বিশেষ দেশের বিশেষ কালের বিশেষ বিজ্ঞান-শাখার পর্যালোচনার উপসংহারে বিজ্ঞানের সামগ্রিক ইতিহাসের রূপটিকে স্মরণ করা, আধুনিক ইতিহাস-বোধের বিচারে, নিশ্চয় বাহুল্য নয়। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক জে. ডি. বার্নাল (J. D. Bernal) তাঁর 'সায়ান্স ইন হিস্ট্রী' নামক মহাগ্রন্থের একস্থানে বিজ্ঞানের সে-রূপকে সংক্ষেপে এইভাবে নির্দেশ করছেন: "The progress of science has been anything but uniform in time and place. Periods of rapid advance have alternated with longer periods of stagnation and even of decay. In the course of time the centres of scientific activity have been continually displaced, usually following rather than leading the migration of the centres of commercial and industrial activity. Babylonia, Egypt, and India have all been the foci of ancient science. Greece became their common heir, and there the rational basis for science as we know it was first worked out. That forward movement of human thought came to an end, even before

the final decay of the classical city States. There was little place for science in Rome and none in the barbarian kingdoms of western Europe. The heritage of Greece retuned to the East from which it had come. In Syria, Persia, and India, even in far-away China, new breaths of science stirred and came together in a brilliant synthesis under the banner of Islam. It was from this source that science and techniques entered medieval Europe. There they underwent a devolopment which, though slow at first, was to give rise to the great outbrust of creative activity which resulted in modern science."—অর্থাৎ, "দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মোটেই সমবেগে হয়নি। পালাক্রমে এসেছে দ্রুত উন্নতির যুগ আর জড়ত্ব ও অবক্ষয়ের দীর্ঘতর যুগ। কালপ্রবাহে বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতার স্নায়ুকেন্দ্র বারবার স্থানপরিবর্তন করেছে—সাধারণতঃ বাণিজ্য-ও শিল্প-গত কর্মক্ষেত্রের স্থানপরিবর্তনের পশ্চাদ্গমন করে, কখনও বা পূর্বগমন করে। ব্যাবিলনিয়া, মিশর এবং ভারতবর্ষ সবাই প্রাচীন বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠান করেছে। গ্রীস পেয়েছে তাদের উত্তরাধিকার, আর সেখানেই বিজ্ঞানের যে বাস্তব যুক্তিনিষ্ঠ ভিত্তির সঙ্গে আমরা এখন পরিচিত তার পত্তন হয়েছে। মননক্রিয়ার এই প্রগতির পথ কিন্তু অবরুদ্ধ হয়েছে প্রাচীন নগর রাষ্ট্রগুলির পতনের পূর্বেই। রোম রাজ্যে

বিজ্ঞানের বিশেষ স্থান ছিল না, ছিল না পশ্চিম ইউরোপের বর্বর রাজ্যগুলিতে। গ্রীসের ঐতিহ্যের ধারা আবার প্রাচ্য দেশগুলিতে ফিরে যায়, যে-প্রাচ্য থেকে এ-ধারা গ্রীসাভিমুখী হয়েছিল। সিরীয়া, পারস্য, ও ভারতবর্ষে, এমন কি সুদূর চীনদেশেও, বিজ্ঞানের নতুন প্রাণস্পন্দন সুরু হয়, আর ইস্‌লামের পতাকাতলে তার এক অপূর্ব সমন্বয় হয়। প্রাচ্য থেকেই বিজ্ঞান ও প্রয়োগকলা মধ্যযুগে ইউরোপে পুনঃপ্রবেশ করে। সেখানে এ-তু'য়ের বিকাশ ঘটতে থাকে, প্রথমে ধীরে ধীরে পরে প্রবল সৃষ্টিশীল তৎপরতায়, আর তারই পরিণতি হিসাবে এসেছে আজকের বিজ্ঞান।"

॥ ইতিহাস ॥

গণিতের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস যেন কালের ফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত এক ইতিবৃত্ত। এ-বৃত্তান্তের পরিধি দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পরবর্তী সাতশ' বৎসরের ইতিহাস প্রায় অবিছিন্ন তামসিকতার ইতিহাস। গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভারতীয়দের মধ্যে আবার কিছুটা গাণিতিক তৎপরতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তবু আজকের জগৎ-সভায় গণিত তথা বিজ্ঞানের প্রাঙ্গণে ভারতের যা আসন তা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। অবস্থার এই বেদনাদায়ক পরিবর্তন

অনেক ভারতীয় মনে গভীর বিস্ময় ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু সন্ধানী, ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন, চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে পরিবর্তনটা দুঃখজনক হ'লেও দুর্বোধ্য বা হতাশাব্যঞ্জক নয়। গণিত বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-কোন ক্ষেত্রের উর্বরতা পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন ভারতে তথা সর্বকালে সর্বদেশে অনুকূল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশেই চিন্তার উৎকর্ষ সম্ভব হয়েছে। প্রতিভা স্থানকালের সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। উপযুক্ত আবহাওয়ায় ভারতভূমিতে আবার তার উন্মেষ সম্ভব। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

মানুষ যেমন ইতিহাস সৃষ্টি করে, ইতিহাসও তেমনি মানুষ সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের দেশের অতীতকে বিশ্লেষণ করে, ইতিহাসের সূত্র অনুসারে বর্তমানকে পরিচালিত করে আমরা আমাদের দেশের এক উজ্জ্বল গাণিতিক ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি। আর, সেই সম্ভাবনাতেই রয়েছে প্রাচীন ভারতের গণিত-ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা।

গ্রন্থপঞ্জী

লেখক বা প্রধান সম্পাদক	গ্রন্থ	প্রকাশক
Stuart Piggott	Prehistoric India	Penguin Books Ltd., Middlesex
Ernest Mackay	The Indus Civilization	Lovat Dickson & Thomson Ltd., London
R. C. Majumdar	The History and Culture of the Indian People (Vols. I—V)	Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay
	The Cultural Heritage of India (Vol. III)	Sri Ramkrishna Centenary Committee, Belur Math, Calcutta
Sarvepalli Radhakrisnan	History of Philosophy : Eastern and Western (Vol. I)	George Allen & Unwin Ltd., London
Bibhutibhusan Datta and Avadhesh Narayan Singh	History of Hindu Mathematics (Parts I & II)	Motilal Banarsi Das, Lahore
Bibhutibhusan Datta	The Science of the Sulba	University of Calcutta
Probodh Chandra Sen Gupta	The Khandakhadyaka	University of Calcutta

Brajendranath Seal	The Positive Sciences of the ancient Hindus	Motilal Banarasi Dass, Delhi
যোগেশচন্দ্র রায়	আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ	কেদারনাথ বসু, কলিকাতা
সুকুমাররঞ্জন দাশ	হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা
সমরেন্দ্রনাথ সেন	বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)	ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, কলিকাতা
রমেশচন্দ্র মজুমদার	প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা